প্রাচীন সভ্যতার রূপরেখা



Approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI (Vide Notification No. T.B. VI/H/79/105 dated 5.12.79)

প্রাচীন সভ্যতার রূপরেখা

● ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য ●

ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী, এম. এ ডি. ফিল্.
অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ (সান্ধ্য বিভাগ)।
ইতিহাস পরিচয় ও মধ্যযুগের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা

বিশ্ববাণী প্রকাশক :: প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৩/১ কলেজ রো, কলিকাতা - ৯

প্রকাশক ঃ শ্রীবিবেকানন্দ ঘোষ, বি. কম.
৩/১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৭৯
সংশোধিত সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮০
তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
চতুর্থ সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৩

মুদ্রাকর ঃ শ্রীপরিমল কুমার বস
বসুশ্রী প্রেস
৮৯/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মূল্য ঃ ৭·০০ টাকা
ভারত সরকারের আনুকুল্যে স্বল্পমূল্যে কাগজে মুদ্রিত

SYLLABUS

CLASS VI

HISTORY OF ANCIENT CIVILISATIONS

A. (i) Why we should read history (to be acquainted with human civilisation, its development)

(ii) How we come to know of ancient people

B. *Early man* : Use of the fire as early as 300,000 B.C. (by 'Peking Man') ; Food-gathering man.

Old Stone Age : Nature of tools and implements, their uses.

New Stone Age : (By 8000 B.C.) : Evolution of tools and implements, Man—a food-producer.

The Neolithic Revolution : Consisted also of domestication of animals ; invention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; dwelling—stone houses with defences ; early transport ; beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts (as evident from cavepaintings, etc.) ; use of formal language as a means of communication ; worship of the Goddess of productivity.

C. *Copper Bronze Age* : Emergence of towns ; changes in production-specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some changes in social life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state. Reasons of the growth of River valley civilisation

D. *The Early Civilisations* (3000 *B.C.*—1500 *B.C.*) : Mesopotamia, Egypt, Indus-valley, China—in outlines.

(i) *Mesopotamia* : (a) Location and antiquity ; earlier development of civilisation than in other areas (b) Fertility of the soil, crops. (c) Defence against floods (d) Other occupations (e) Achievements of Sumerians : imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script

(ii) *Egypt* : (a) Location and nature of the land (b) The Pharoah, the priest. script and scribes, tax-collectors and 'soldiers' (workers) (c) Trade (d) The Pyramids (Examples) (e) Religious beliefs (f) Chief occupations.

(iii) *The Indus-valley* : (a) The discoveries (brief reference to locations and findings) (b) Town Planning (c) Food and other articles of use (d) Crafts (e) Trade (f) Worship (g) Light thrown by relics upon classification in society.

(iv) *China* : (a) Valley Hwang Ho and Yangtze Kiang (b) China in early times (c) Myths (particularly of flood).

(v) Common features, in brief, of the riparian civilisations with special reference to social and economic life.

E. *The Iron Age Societies* : (a) Discovery and use of iron, its impact (b) Main features of social and economic life (c) Growth of Kingship.

I. (i) *Babylon* : Farming and commerce, Temples and Priests ; Learning and cultures ; The Code of Hamurabi—nature of society revealed by the Code.

(ii) *Egypt as an Imperial power* : Colonies ; The power of priests.

(iii) *Iron* : Rise of Persia ; Zoroaster.

(iv) *The Jews* : Hebrews in Egypt ; Hebrews exodus under Moses—flight from slavery.

II. *Greece* (only in broad outlines) : An introductory note on the influence of Crete ; The Homeric Age ; The city-state ; cultural interchange ; colonisation. Athens and Sparta—their social and political life Athens vs. Sparta. Cultural greatness of Athens ; Literature, arts, religion—brief reference to a few persons e.g. Pericles, Sophoclea, Socrates, Herodotus. Macedon : Alexander—his invasion of India, fall of the Empire. Roman conquest of Greece.

III. *Rome* : Origin of Rome ; Conflict with Carthage ; Early Romano society ; Padtricians and Plebians ; Roman citizenship ; Slavery and Slave revolts (Spartacus) Julius Caesar : end of the Roman Republic ; New Empire ; Eventual decline and fall. Rise of Christianity.

IV. *China* : 'Great Shang' ; Confucius—his teachings ; Building the Great Wall. The China Empire.

V. *India* : (a) The coming of the Aryans (b) The Vedas (c) Early Aryan Society, religion and political organisation (with reference to the Vedas) (d) The Epics (e) The rise of Jainism and Buddhism (f) The Empires —a brief outline of developments from the Mauryas to the Kushanas—to the decline of the Gupta Empire (g) Ancient Bengal upto the decline of the Guptas (on the basis of proven historical materials viz. inscriptions and literary evidence) (h) Foreign contacts (particularly with Central Asia) their impact upon society and trade (i) Foreign travellers —Megasthenes and Fa-hien—general picture of society as revealed in their accounts (in brief outlines only) (j) A brief summary of ancient Indian developments in arts and architecture, literature, education (Taxila and Nalanda) and Sciences (Astronomy, Mathematics Chemistry, Medicine).

● সূচীপত্র ●

প্রথম অধ্যায় ঃ আদিকথা ১-৩

আমরা ইতিহাস পড়ি কেন? প্রাচীন কালের মানুষের কথা আমরা কেমন করে জানি?

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আদিম যুগের মানুষ ৪-১৩

জাভাম্যান, পিকিং-ম্যান, আগুনের ব্যবহার, খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ ঃ অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের ধরন এবং ব্যবহার।

নব্যপ্রস্তর যুগ ঃ অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ক্রমবিকাশ, খাদ্য উৎপাদকরূপে মানুষ, নব্য প্রস্তরযুগীয় বিপ্লব, পশুপালন, মৃৎশিল্পের আবিষ্কার, বয়ন শিল্প, ঘরবাড়ি, পরিবহন ব্যবস্থা, সমাজবদ্ধ জীবনের সূচনা, ধর্মবিশ্বাস ও শিল্পচর্চা, ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষা ব্যবহার, ফসলের দেবী পূজা।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ ১৪-১৮

উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন, বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর উদ্ভব, ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্য বিনিময়, সামাজিক জীবনে পরিবর্তন, শ্রেণীবিভাগ, আন্তঃ-গোষ্ঠী বিরোধ, আদিম ধরনের রাষ্ট্রের উৎপত্তি, নদীমাতৃক সভ্যতা উদ্ভবের কারণ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রথম যুগের সভ্যতা ১৯-৪৯

ক. মেসোপটামিয়া ঃ অবস্থান ও প্রাচীনতা, মানব-সভ্যতার প্রথম বিকাশ, জমির উর্বরাশক্তি ও শস্যাদি, বন্যার বিরুদ্ধে সতর্কতা, অন্যান্য উপজীবিকা, সুমেরীয়দের অবদান, মনোরম ইমারত, কাদামাটির ইটে তৈরী মন্দিরসমূহ, দেওয়াল চিত্র (ফ্রেস্কো) পাথর-কাটাই, ধাতুবিদ্যা, পরিবহন ব্যবস্থা ও বাণিজ্য, লিপি।

খ. মিশর ঃ অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি, ফ্যারাও ও পুরোহিত সম্প্রদায়, লিপি ও লিপিলেখক বা করণিক, শুল্ক-আদায়কারী এবং সৈনিকগণ (শ্রমিকগণ), ব্যবসা-বাণিজ্য, পিরামিডসমূহ, ধর্মবিশ্বাস, প্রধান, পেশা বা বৃত্তি।

গ. সিন্ধু সভ্যতা ঃ আবিষ্কারসমূহ, নগর পরিকল্পনা, খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র, কারিগরি শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মানুষ্ঠান, সমাজে শ্রেণী-বিন্যাস।

ঘ. মহাচীন ঃ হুয়াং-হো এবং ইয়াং-সি-কিয়াং উপত্যকা, পুরাকালের চীন, পৌরাণিক অতিকথা।

ঙ. নদীমাতৃক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ঃ জীবনযাত্রার মান, লিপি ও বিজ্ঞান বিদ্যার আবিষ্কার, কৃষকশ্রেণী, কারিগর ও শিল্পী, ব্যবসা-বাণিজ্য।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ লৌহযুগের সমাজ ৫০-১১২

লোহার আবিষ্কার ও তার প্রতিক্রিয়া, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান লক্ষণসমূহ, জাতিত্ববোধের ক্রমপ্রসার।

১. **ক. ব্যাবিলন** ঃ চাষ-বাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, মন্দির ও পুরোহিত-বর্গ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, হাম্মুরাবির আইন সংকলন বা কোড, হাম্বুরাবির কোডে আভাসিত সমাজের প্রকৃতি।

খ. মিশরে সাম্রাজ্য-শক্তির অভ্যুদয় ঃ উপনিবেশসমূহ, পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা।

গ. ইরান ঃ পারস্যের অভ্যুত্থান, আর্কিমিনিয় রাজবংশ, দারিয়ুস, জরথুস্ট্র।

ঘ. ইহুদীগণ ঃ মিশরে হিব্রুগণ, মোসেসের নেতৃত্বে হিব্রুদের নিষ্ক্রমণ —দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ।

২. **গ্রীস** ঃ গ্রীসের সভ্যতার উপর ক্রীটের প্রভাব, হোমারের-যুগ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতিক-বিনিময় ও উপনিবেশ স্থাপন।

এথেন্স ও স্পার্টা ঃ এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, এথেন্স বনাম স্পার্টা।
এথেন্সের সাংস্কৃতিক মহিমা ঃ মহান পেরিক্লিস, সাহিত্য, সোফোক্লিস, হেরোডোটাস, শিল্পকলা, ধর্ম ও দর্শন, সক্রেটিস; ম্যাসিডন ঃ আলেকজান্ডার, আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান, রোম কর্তৃক গ্রীস বিজয়।

৩. **রোম** ঃ রোমের উৎপত্তি, কার্থেজের সঙ্গে রোমের সংঘর্ষ; প্রাচীন রোমক সমাজ ঃ প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান, রোমের নাগরিক অধিকার,

ক্রীতদাস-প্রথা ও ক্রীতদাস-বিদ্রোহ ; জুলিয়াস সীজার ঃ রোমক প্রজাতন্ত্রের অবসান, নূতন রোমক সাম্রাজ্য, রোমক সাম্রাজ্যের অবসান ও পতন, খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান।

৪. **চীন** ঃ মহান সাঙ্, কনফুসিয়াস ও তাঁর উপদেশাবলী ; মহাপ্রচীর নির্মাণ ঃ চি'ন সাম্রাজ্য।

৫. **ভারতবর্ষ** ঃ আর্যজাতির ভারতে আগমন, বসতিবিস্তার, চারি বেদ, প্রাচীন আর্য সমাজ, ধর্মচর্চা, আর্যদের রাজনৈতিক সংগঠন, রামায়ণ, মহাভারত, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়, ভারতে সাম্রাজ্য শক্তির অভ্যুত্থান ; প্রাচীন বঙ্গদেশ ঃ জনপদ, কৌম সমাজের শাসন, প্রাচীন বাংলার গ্রাম, সমাজ ও শিল্পকলা, গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনে বাংলা, ভাষা ও সাহিত্য ; বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঃ মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ও সংস্কৃতি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ; বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ ঃ মেগাস্থিনিসের বিবরণী ; ফা-হিয়েনের বিবরণী ; প্রাচীন ভারতে প্রতিভার বিকাশ ঃ শিল্পে ও স্থাপত্যে, সাহিত্যে, শিক্ষায় ; বিজ্ঞানে ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান।

ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন



প্রথম অধ্যায়

আদিকথা

আমরা ইতিহাস পড়ি কেন ?

ইতিহাস হচ্ছে পুরনো দিনের কাহিনী। আমরা ইতিহাস পড়ি সেই পুরনো দিনের কাহিনী জানবার জন্য। পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে নানা ঘটনা ঘটেছে। সমস্ত ঘটনা এক সময়ে ঘটেনি এবং এক জায়গায়ও ঘটেনি। কোন্ ঘটনা আগে ঘটেছে, কোন্‌টা পরে, কোন্‌টা কোথায় ঘটেছে, আগেকার ঘটনার সঙ্গে পরের ঘটনার মিল কোথায়, তা দেখিয়ে যে কাহিনী লেখা হয় তাকে বলা হয় ইতিহাস।

মানুষের ইতিহাস নানা দেশের বহু মানুষের হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। তাদের অগ্রগতির পথে অসংখ্য বাধা বিপদ দেখা দিয়েছে। মানুষ বুদ্ধিবলে সকলের মিলিত চেষ্টায় সে-সব বাধা অতিক্রম করে জয়লাভ করেছে। অতীত যুগের একেবারে অসহায় অবস্থা থেকে মানুষ নানা জিনিস আবিষ্কার করে নিজেদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। তারপর মিলিতভাবে বসবাস করতে করতে তারা এক উন্নত ও সুশৃংখল সমাজ গড়ে তুলেছে। এই উন্নত জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে বলে সভ্যতা।

যুগে যুগে, কালে কালে পৃথিবীর নানা স্থানে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। যে সভ্যতার ভেতরে কালক্রমে কোন ত্রুটি দেখা দিয়েছে, সে সভ্যতার ঘটেছে পতন। হয়তো তার জায়গায় দেখা দিয়েছে নতুন কোন সভ্যতা।

কেন যে ঐভাবে একটি সভ্যতার পতন ঘটে আর কেনই বা নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে—এ সবেরই বিবরণ আমরা পাই ইতিহাসে। ইতিহাস পড়ে আমরা জানতে পারি, আমরা আজ সভ্যতার যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছি তা হঠাৎ একদিনে আসে নি। হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় ধাপে ধাপে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সুসভ্য সমাজ গড়ে উঠেছে। যাঁদের চেষ্টার ফলে আমরা এই উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছি তাঁরা আমাদের পূর্ব-পুরুষ। তাঁদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, তাঁরা যা করতে পারেননি, আমরা তা করে চলেছি। অতীতের পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপ ইতিহাস পড়ে জানতে পারা যায় বলেই যে শুধু ইতিহাস পড়া তা নয়। তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যাতে শিক্ষালাভ করতে পারি, সেজন্যও ইতিহাস পড়তে হয়। ইতিহাসে যেমন নিজের দেশের কথা থাকে তেমনি বিদেশেরও কথা থাকে। সেজন্য ইতিহাস পড়লে আমরা অন্যদেশের সঙ্গে

নিজেদের দেশের তুলনা করতে পারি। তাতে যেমন নিজের দেশের প্রতি ভালবাসা বাড়ে তেমনি অন্যদেশের প্রতিও শ্রদ্ধা জন্মে।

● প্রাচীন কালের মানুষের কথা জানি কেমন করে ?

প্রাচীন কালের মানুষের কাহিনী জানবার উপায় হচ্ছে ইতিহাস। কিন্তু সে কাহিনীর কথা জানা সহজ নয়। মানুষের ইতিহাসের আরম্ভ দু-এক হাজার বছরের কথা নয়। সে কয়েক লক্ষ বছর আগের কথা। এত প্রাচীন কালের ইতিহাস তো কোথাও লেখা নেই।

তবে মানুষ যেখানেই বসবাস করে, তার পাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে নানা চিহ্ন। তা থেকে আন্দাজ করে নেওয়া হয় তাদের জীবনধারা কেমন ছিল। হয়তো অনেকের বাড়িতেই পূর্বপুরুষদের ছবি টাঙানো আছে বাড়ির দেওয়ালে। পুরনো আলমারিতে বা বাক্সে বাপ-ঠাকুরদার বা তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের লেখা জমাখরচের খাতা, চিঠিপত্র বা এই ধরনের কিছু-না-কিছু জিনিস থাকে। সে সব থেকে তাঁরা দেখতে কেমন ছিলেন, কোন্ জিনিস খেতেন, কেমন পোশাক-পরিচ্ছদ পরতেন, এই রকম নানা বিষয় জানতে পারি। এসব থেকে তাঁদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটা ধারণাও আমরা করতে পারি।

অনেকটা এমনি ভাবেই পণ্ডিতেরা প্রাচীন মানুষদের হাতে তৈরি কিংবা তাদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র দেখে তাদের জীবনযাত্রার একটা ধারাবাহিক বিবরণী রচনা করেছেন। এ ধরনের বেশির ভাগ জিনিসই পাওয়া গেছে মাটি খুঁড়ে মাটির তলা থেকে। এ কাজকে বলা হয় **খনন** ; আর খননকার্য করে এসব ইতিহাস যাঁরা উদ্ধার করেন তাঁদের বলে **পুরাতত্ত্ববিদ্**।

নদীর ধারে কুড়িয়ে পাওয়া প্রাচীন যুগের পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র, কিংবা ধাতুর তৈরি জিনিসপত্র, মৃৎপাত্র, স্মৃতিস্তম্ভ, মূর্তি, মুদ্রা ইত্যাদি অজস্র জিনিস মাটি খুঁড়ে বার করেছেন পুরাতত্ত্ববিদেরা। হয়তো মাটির নিচে চাপা পড়ে গেছে কোনও প্রাচীন শহর, নয়ত কোনও গুহায় পাওয়া গেল প্রাচীন মানুষের বসবাসের চিহ্ন—তখন তা থেকে তাঁরা সেই অতীতের জীবনযাত্রার বিষয়ও অনুমান করতে পারেন। প্রাচীন যুগের সমস্ত সভ্যতার ইতিহাসই এইভাবে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা আবিষ্কার করেছেন।

মানুষ যখন লিখতে শেখেনি, তখন সে তার নিজের কোন কথা পরবর্তী-কালের মানুষের জন্য রেখে যেতে পারে নি। সে সময়কার মানুষদের সম্বন্ধে জানবার জন্য তাদের ব্যবহৃত নানারূপ জিনিসপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টায় জানতে পারা গেছে প্রায় পাঁচ লক্ষ

বছর আগে থেকে শুরু করে সভ্যতার পত্তন হবার সময় পর্যন্ত মানুষের পূর্বপুরুষেরা দেখতে কেমন ছিল, কেমন করে তারা পাথর দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত, কিভাবেই বা তারা গুহার মধ্যে বাস করত, বনে-জংগলে জীব-জন্তু শিকার করত, কেমন করে আগুন জ্বালাতে শিখল, বনের পশুকে পোষ মানিয়ে চাষবাসে মন দিল, মাটির জিনিসপত্র তৈরি করতে শিখল, ব্যবসা-বাণিজ্য করে গ্রাম ও শহর গড়ে তুলল। এক কথায়, অসভ্যতা ও বর্বরতার পর্যায় পার হয়ে আদিম মানুষ ধীরে ধীরে কিভাবে সভ্যতার দিকে এগিয়ে এল, ইতিহাসের সেই সমস্ত রোমাঞ্চকর কাহিনী নানা আবিষ্কারের ফলেই জানা সম্ভব হয়েছে।

যে সময় থেকে মানুষ লিখতে শিখল, তখন থেকে তাদের কাহিনী আর লুপ্ত হতে পারল না। মাটির পাত্রের উপরে, পাহাড় ও স্তম্ভের গায়ে, পুরনো মন্দিরের দেওয়ালে নানা রকমের ভাষায় অনেক পুরনো লেখার খোঁজ পাওয়া গেছে। এগুলিকে বলা হয়—**লেখন**। এ ধরনের অনেক লেখনেরই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবু এখনও অনেক পুরনো লিপির ভাষা অজানা রয়ে গেছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীনকালের মানুষদের সম্পর্কে জানবার বড়ো সূত্র দুটি—খনন ও লেখন। এ ছাড়া প্রাচীন আমলের রাজাদের মুদ্রাও এ ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করেছে। ভারতের বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গ্রীসের ইলিয়াড, অডেসি প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পুরনো দিনের অনেক খবর একালের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১. কতকাল আগে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল ?
২. লিখিত ইতিহাসে আমরা মানবজাতির কতকালের জীবনযাত্রার কাহিনী জানতে পারি ?
৩. কোন্ কোন্ সূত্র থেকে ইতিহাসের কি কি মালমসলা সংগ্রহ করা হয়েছে ?
৪. প্রাচীন কালের মানুষদের সম্পর্কে জানবার সহজ উপায় কী ?
৫. ‘খনন’ ও ‘লেখন’ কাকে বলে? এ থেকে কি কি জানতে পারা যায় ?

মৌখিক প্রশ্ন

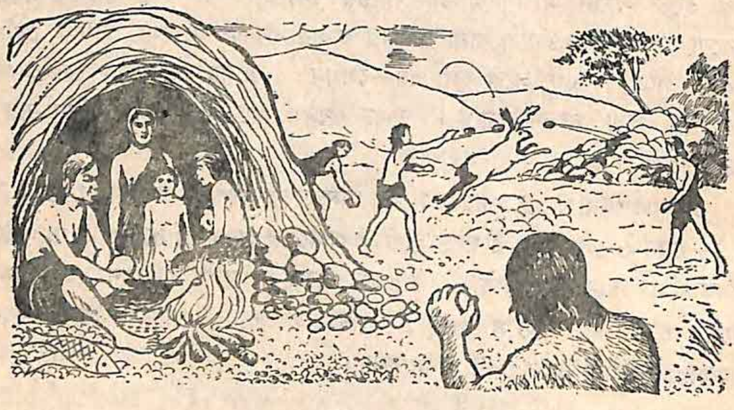
১. ইতিহাস কাকে বলে এবং ইতিহাসের মূল লক্ষ্য কী ?
২. ইতিহাসের ভিতর দিয়ে আমরা কাদের কথা জানতে পারি ?
৩. “তাঁদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি।”—তাঁরা কারা ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম যুগের মানুষ

জীবজগতের সেরা জীব হচ্ছে মানুষ। কারণ, বুদ্ধির জোরে সে অন্য সব জীবকে ছাড়িয়ে গেছে। তাই গোটা পৃথিবী তার বশে। অথচ এই মানুষ হঠাৎ একদিন পৃথিবীতে আসেনি। প্রাণের ক্রমবিকাশের ধারায় আদি প্রাণী বারংবার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। মানুষের ঠিক আগেকার রূপ **বনমানুষ, বানর ও লেমুর**।

জাভা-ম্যান ঃ এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে কোন এক সময়ে পৃথিবীতে প্রথম সত্যিকার মানুষের আবির্ভাব ঘটে। এর আগে যে সমস্ত মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেছে, বিজ্ঞানীরা তাদের প্রায়-মানুষ



আদিম যুগের খাদ্যসংগ্রহকারী মানুষ

বলেছেন। যবদ্বীপে (ইন্দোনেশিয়া) ট্রিনিটি নদীর তীরে মাটি খুঁড়ে এক ধরনের অতি প্রাচীন মানুষের পাথুরে কঙ্কাল পাওয়া গেছে। পরীক্ষা করে জানা গেছে, সেই অদ্ভুত মানুষ দেখতে কিছুটা বানর কিছুটা মানুষের মতো। এরা **যবদ্বীপের মানুষ বা জাভা-ম্যান** বলে পরিচিত।

পিকিং-ম্যান ঃ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে চীনের পিকিং শহর থেকে কিছু দূরে চৌ কৌটিন নামে এক গুহায় এক রকমের মানুষের মাথার খুলি, দাঁত এবং চোয়ালের পাথুরে কঙ্কাল পাওয়া যায়। মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত তাদের ব্যবহার করা নানা জিনিসপত্র দেখে বিজ্ঞানীমহলে দারুণ সাড়া জাগে। তাঁরা এর নাম রাখলেন **পিকিং-ম্যান** অর্থাৎ পিকিং-মানুষ। জাভা-ম্যান এবং পিকিং-ম্যান প্রায় এক সময়ের হলেও পিকিং-ম্যান আদিম যুগের সত্যিকার

মানুষদের স্বজাতি বলে প্রমাণিত হলো। জাভা-ম্যান এবং পিকিং-ম্যানদের ফসিল আবিষ্কারেরও অনেক আগে জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরের কাছে নিয়ানডার্থাল নামে এক জায়গায় আর এক রকমের মানুষের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে **নিয়ানডার্থাল ম্যান**। বিজ্ঞানীদের মতে এরা এক রকমের উপমানুষ।

আগুনের ব্যবহার ঃ পিকিং-ম্যানরা আগুনের ব্যবহার জানত। কারণ এদের গুহার এক কোণে কিছু ছাই এবং গুহার মধ্যে নানা জীবজন্তুর আধ-পোড়া হাড়-গোড় পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকদের ধারণা, এরা প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে পিকিং অঞ্চলে বাস করত। জাভা-ম্যানদের তুলনায় এরা অনেক সভ্য ছিল।

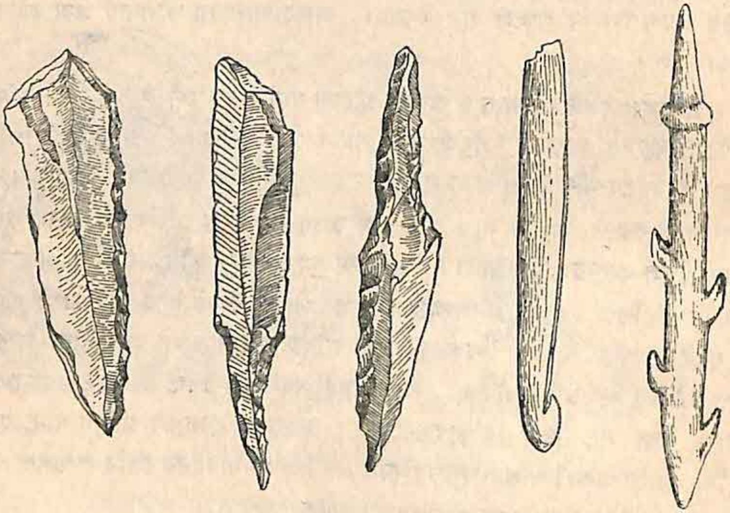
খাদ্যসংগ্রহকারী মানুষ ঃ আদিম যুগের মানুষদের জীবনযাত্রা ছিল বনের জীব-জন্তুদের মতো। বনজঙ্গল, মাঠ-ঘাট, নদী-হ্রদ প্রভৃতি জলাজমি থেকে তারা যে যার মতো খাদ্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করত। তারা খাদ্য উৎপাদন করতে জানত না। গাছের ফলমূল, বনের শাকসবজি, নরম কচি পাতা ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। এ ছাড়া হ্রদ ও নদ-নদী থেকে মাছ, শামুক, গেঁড়ি কুড়িয়ে এবং বনেজঙ্গলে গিয়ে পশু শিকার করে তার মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত। শিকারের জন্য পাথর ঘষে ধারালো করে তারা অস্ত্রশস্ত্রও তৈরি করতে শিখেছিল। তবে সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বা হাতিয়ারগুলো মসৃণ ছিল না, ছিল এবড়ো-খেবড়ো। তাহলেও সেগুলি আদিম মানুষের বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়। পিকিং-ম্যানদের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

● প্রাচীন প্রস্তর যুগ

অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের ধরন এবং ব্যবহার ঃ অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ারের ধরন ও ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রায় বারংবার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষের কাহিনীকে কয়েকটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। একেবারে গোড়ার দিকে অস্ত্রশস্ত্র এবং শিকারের অন্য সাজসরঞ্জাম তৈরির উপকরণ ছিল পাথর। পরে অবশ্য পাথরের সঙ্গে অন্যান্য হাতিয়ার যোগ হয়। আরও অনেক পরে পাথরের জায়গা দখল করে ধাতু। সেইজন্য পণ্ডিতেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের গোড়ার দিকের নাম দিয়েছেন **প্রস্তর যুগ**। প্রস্তর যুগকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম দিকে পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার ছিল এবড়ো-খেবড়ো ধরনের। আদিম মানুষের

জীবনযাত্রার সঙ্গে অন্য জীব-জন্তুর জীবনযাত্রারও খুব বেশী তফাত ছিল না। এইজন্য সেই সময়কে **প্রাচীন প্রস্তর যুগ** বলা হয়েছে। পণ্ডিতেরা এই অবস্থাকে **অসভ্যতার** পর্যায় বলে উল্লেখ করেছেন। এর শেষ দিকে মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটে এবং অস্ত্রশস্ত্রগুলি উন্নত ও মসৃণ হয়। এই জন্য শেষভাগের নাম দেওয়া হয় **নব্য প্রস্তর যুগ**। সমাজ বিজ্ঞানী মরগ্যান এই যুগের অবস্থাকে **বর্বরতার** পর্যায় বলে উল্লেখ করেছেন।

বাঁচার তাগিদে আদিমকালের মানুষ আগে থেকেই যেমন-তেমনভাবে পাথর দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি করা শুরু করেছিল। প্রাচীন প্রস্তর



প্রাচীন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

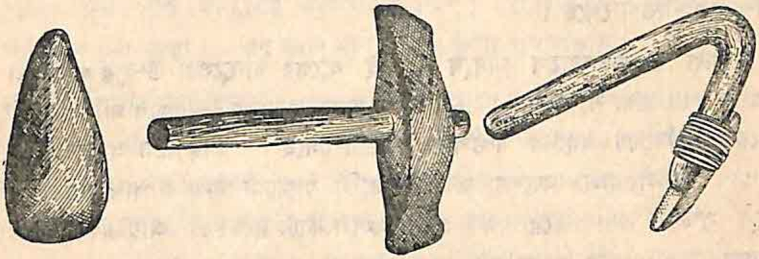
যুগে এসে মানুষ এ ব্যাপারে আগেকার চেয়ে বাহাদুরি দেখাল। আগে বড়ো বড়ো বন্য জন্তু শিকারের জন্য মানুষ কাঠের গদা, কাঠ ও পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি বল্লম প্রভৃতি ব্যবহার করত। এই যুগে মানুষ এক নতুন ধরনের হাতলবিহীন হাতকুড়ুল তৈরি করল। এ দিয়ে পশু শিকার এবং মাটি খুঁড়ে গাছের মূল সংগ্রহের কাজ সহজ হলো।

এ যুগের মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে জীবজন্তুর হাড়, হরিণের শিং, হাতীর দাঁত প্রভৃতি আরও কতকগুলি বস্তু ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে ওঠে। এই সমস্ত বস্তু দিয়ে তৈরি জিনিসকে ঘষে-মেজে ধারালো করবার নতুন প্রক্রিয়াও তারা আবিষ্কার করল। তা ছাড়া হরিণের শিং কিংবা হাড় অথবা চ্যাপ্টা পাথরের ভিতর গোল ছিদ্র করবার প্রণালীও তারা বের করে ফেলল। খুব

সম্ভব, চক্রাকার গতি সৃষ্টির জন্য এই ধরনের ছিদ্র করবার ব্যবস্থা হয়। পরবর্তীকালে যে চাকা (হুইল) আবিষ্কার হয়, এ তারই গোড়াপত্তন।

● নব্য প্রস্তর যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০ অব্দ)

অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ক্রমবিকাশ : প্রায় দশ থেকে বারো হাজার বছর আগে প্রাচীন প্রস্তর যুগের অবসান হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এগিয়ে চলার কাহিনী এক নতুন পর্যায়ে গিয়ে পেঁছায়। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের আরও উন্নতি হয় এবং



নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

তাদের জীবনযাত্রায়ও অনেক পরিবর্তন ঘটে। মেসোপটামিয়া, মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, জুডিয়া, পারস্য ইত্যাদি অঞ্চলের মানব-সমাজ চাষ-আবাদ এবং পশুপালনের সাহায্যে খাদ্যবস্তুর যোগান বাড়াবার চেষ্টা করে।

নব্য প্রস্তর যুগের সেরা হাতিয়ার ও অস্ত্র হচ্ছে হাতলওয়ালা মার্জিত ধরনের পাথরের কুড়ুল ও তীর-ধনুক। তীরের ফলাগুলি ছিল



তীর-ধনুকের সাহায্যে পশু শিকার

চকমকি পাথরে তৈরি। সেগুলি দেখতে ছিল সুন্দর এবং তীরের মাথার সঙ্গে শক্ত করে সেগুলি বাঁধা থাকত। তীর-ধনুকের ব্যবহার শেখার ফলে

দূর থেকে পশুশিকার করা সহজ হয়ে উঠল। মাছ ধরার জন্য তারা বড়শি বা কোঁচ ব্যবহার করত।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে নীল নদের পশ্চিমে একটি হ্রদের তীরে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে বেশ কিছুসংখ্যক মানুষ বসবাস শুরু করে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাদের বসতির চিহ্ন হিসাবে কিছু আবর্জনাস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার ভিতর থেকে অসংখ্য চকমকি পাথরে তৈরি তীরের ফলা, হাড়ের তৈরি কোঁচ, বল্লম প্রভৃতি রকমারি অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে।

খাদ্য উৎপাদকরূপে মানুষ ঃ এই যুগের মানুষেরা উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য মজুত করে রাখা শুরু করে। এই রকম শস্যভান্ডারের নিচেকার মাটি খুঁড়ে কয়েকটি বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আছে একটি কাঠের হাতলওয়ালা কাস্তে, তার দাঁতগুলি ধারালো চকমকি পাথরে তৈরি। খুব সম্ভব, এটা দিয়ে ক্ষেত থেকে ফসল কাটা হতো। আর একটি হচ্ছে পাথর দিয়ে তৈরি হাতে ঘোরানো জাঁতা। এতে শস্য গুঁড়ো করে ময়দার মতো করা হতো। এ যুগের মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে একখন্ড কাঠের মাথায় হরিণের শিং খুব শক্ত করে বেঁধে তাই দিয়ে মাটি চাষ করা শুরু করল। এইভাবে ধীরে ধীরে চাষ-আবাদের সূচনা হলো।

এই যুগের গৃহস্থালীর সাজসরঞ্জামের মধ্যে ছিল এক রকমের মাটির তৈরি বড়ো জালার মতো জিনিস, তার উপর চামড়া বিছানো থাকত। অনেক সময় বড় গাছের গুঁড়ি কেটে তার ভিতরটা চেঁচে ফাঁপা করে চামড়া দিয়ে উপরটা ঢেকে জালার মতো করে ব্যবহার করা হতো। মনে হয়, এই ধরনের জালাতে খাদ্যশস্য মজুত করে রাখা হতো। এছাড়া নব্য প্রস্তর যুগে মানুষের জীবনযাত্রায় এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে যার জন্য ঐতিহাসিকেরা সেই পরিবর্তনকে **নব্য প্রস্তর যুগীয় বিপ্লব** বলে উল্লেখ করেছেন।

নব্য প্রস্তরযুগীয় বিপ্লব ঃ প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষেরা ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক, আর নব্য প্রস্তর যুগের মানুষেরা হয়ে উঠল খাদ্যউৎপাদক। নব্য প্রস্তর যুগে পুরুষেরা যখন শিকারে বেরুত, মেয়েরা তখন বনে জংগলে গিয়ে ঘাসের বীজ সংগ্রহ করে আনত। একালের লোকেরা গম এবং যবের বার্লি যেমন ভাবে খায়, নব্য প্রস্তর যুগের লোকেরা তেমনিভাবে ঘাসের বীজ খেত। শুধু তাই নয়, খাদ্যের পরিমাণ বাড়াবার জন্য তারা সেই বীজ মাটিতে বুনে আগাছা পরিষ্কার করে এক রকমের চাষবাস শুরু করে দেয়।

পশুপালন ঃ বনের পশুকে পোষ মানিয়ে নানা কাজে ব্যবহার এই যুগের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের পোষ-মানানো প্রথম পশু সম্ভবতঃ কুকুর। শিকারের সময় সঙ্গী হিসাবে কুকুর এদের সাহায্য করত। বনে বনে ঘুরে পশু শিকার করতে গিয়ে মানুষ নানা বন্য পশুর স্বভাব জানবার সুযোগ পায় এবং গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকরছানা, গাধা, ঘোড়া, উট প্রভৃতি পশুকে পোষ মানাতে শুরু করে। এদের মধ্যে অনেক পশু খাবার দুধ যোগাত, আবার দরকার হলে মানুষ অনেক পশু মেরে তাদের মাংস খেত। গাধা, ঘোড়া, উট ছিল মানুষের চলাফেরার বাহন। ভেড়ার লোম পশম হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এর ফলে মানুষ হয়ে উঠল পশুপালক।

মৃৎশিল্পের আবিষ্কার (চাকা) ঃ মানুষ অনেক আগে থেকেই লতাজাতীয় জিনিস দিয়ে ঝুড়ি তৈরি করত। পরে এর উপর মাটির পলেস্তারা লাগিয়ে তা দিয়ে বাসন-কোসনের প্রয়োজন মেটাতে শুরু করেছিল। কখনও কখনও ঝুড়িগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে মাটির পলেস্তারাটাকে শক্ত করে নেওয়া হতো। তবে মৃৎশিল্প (pottery) বলতে যা বোঝায়, তা নব্য প্রস্তর যুগের দান।



কুমোরের চাকার আবিষ্কার

কারণ, এই যুগেই চাকা বা কুমোরের চাকা (wheel) আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে অল্প সময়ে নানা ধরনের মজবুত ও সুদর্শন মাটির পাত্র তৈরি করা সম্ভব হয়। কুমোরের ঘুরন্ত চাকার উপর এক তাল নরম কাদা-মাটি রেখে পটুহাতে স্বচ্ছন্দে কয়েক মিনিটের মধ্যে এক-একটা মাটির পাত্র তৈরি করে ফেলা যায়। মাটির পাত্র তৈরি যখন ঘরোয়া ব্যাপার ছিল তখন মেয়েরাই হাত দিয়ে তা তৈরি করত। কিন্তু চাকা আবিষ্কারের পর যখন এটা বিশেষ শিল্পকাজ হয়ে উঠল, তখন থেকে এ বিষয়ে পুরুষেরাই বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠল। সে সময়কার কিছু কিছু বিচিত্র মাটির পাত্রও পাওয়া গেছে। চাকার আবিষ্কার শুধু মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে নয়, বয়ন এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দিল।

বয়নশিল্প ঃ সে যুগের শিল্পবিদ্যার মধ্যে মৃৎশিল্পের পরেই বয়ন শিল্প-এর নাম করতে হয়। আদিমকালের মানুষ পরিচ্ছদ হিসাবে গাছের বাকল ব্যবহার করত, শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পশুর চামড়া গায়ে জড়াত। নব্য প্রস্তর যুগে ক্রমেই মানুষ হাতে বোনা পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে শুরু করে। সুতো-কাটা এবং কাপড়-বোনার যে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, বিনুনি করা এবং বোনা যে সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদের টুকরো, এমনকি মিহি ভাবে বোনা টুইল কাপড়ের অংশ যা পাওয়া গেছে তা সে যুগের বয়ন-শিল্পের সাক্ষ্য দেয়। সরঞ্জামগুলির বেশির ভাগ ছিল পশুর পাঁজরের হাড় দিয়ে তৈরি এবং সুতো ছিল শণের। সে যুগের কোন তাঁত ঠিকমত পাওয়া না গেলেও যে সরঞ্জাম পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না যে, তাঁতের মতো কাপড়-বোনার কোন যন্ত্রপাতি তখনও ছিল।

ঘরবাড়ি ঃ প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল অনেকটা ভবঘুরে। কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগের মানুষেরা বাড়ি তৈরি করে সংসারী হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। নব্য প্রস্তর যুগের প্রথমদিকে বেশির ভাগ বাড়ি হতো উঁচু টিলার মতো জায়গায়। সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণেরও সুবন্দোবস্ত ছিল। বাড়ির চারদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হতো। মধ্য ও দক্ষিণ জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এমন অনেক বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। সে সময় মাটি এবং পাথরের টুকরো দিয়েই বাড়ি তৈরি করা হতো। এই ভাবে গড়ে উঠত এক একটি গ্রাম। গ্রামগুলি ছিল বেশ সুরক্ষিত। বুনো জন্তু-জানোয়ার কিংবা শত্রুপক্ষ যাতে আক্রমণ করতে না পারে, সে দিকে নজর রেখে শক্ত বেড়া দিয়ে অথবা চারদিকে গড় কেটে গ্রামগুলিকে ঘিরে রাখা হতো। জর্ডান উপত্যকার মরূদ্যান অঞ্চলের জেরিকো এমনই একটি পুরনো গ্রাম। প্রায় আট একর জমির উপর গড়ে-ওঠা এই গ্রামটি ছিল সুরক্ষিত।

পরিবহন ব্যবস্থা ঃ নব্য প্রস্তর যুগে পরিবহন বা চলাচলের ব্যবস্থারও বেশ উন্নতি হয়। আদিমকালে মালপত্র বয়ে নেবার জন্য সম্বল ছিল হাত, কাঁধ, পিঠ বা মাথা। কিন্তু এভাবে খুব ভারী জিনিস বয়ে নেওয়া চলে না। তাই ভারী জিনিস মাটির উপর দিয়ে টেনে নেওয়া শুরু হলো। গাধা, ঘোড়া, উট প্রভৃতি পশু দিয়ে মালপত্র আনা-নেওয়া চলতে লাগল। আবার এদের পিঠে চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াতও সহজ হয়ে উঠল। কিন্তু এভাবে বেশী মাল নেওয়া কঠিন, আবার মাটির উপর দিয়ে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেলেও জিনিসপত্রের যেমন ক্ষয়ক্ষতি হয় তেমনি বহু লোকেরও প্রয়োজন হয়। তাই মানুষ ভাবতে ভাবতে প্রথমে একরকম চাকা-

বিহীন টানা-গাড়ি তৈরি করল। এতে পরিবহনের কাজ আগের চেয়ে সহজ হলো, তবে সমস্যা ভালোভাবে মিটল না। ক্রমে মানুষের মগজে নতুন বুদ্ধি খেলে গেল। সহসা একদিন তারা চাকা আবিষ্কার করে ফেলল।

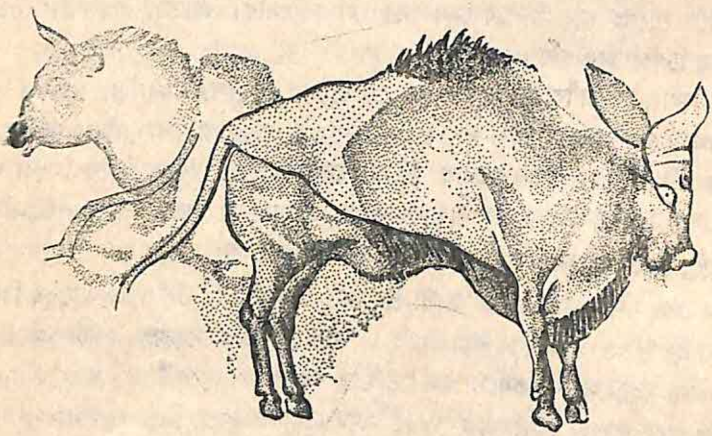
আগুন আবিষ্কারের মতো চাকা আবিষ্কারও মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটা বড়ো রকমের ঘটনা। টানা গাড়ির সঙ্গে চাকা জুড়ে দেওয়ার ফলে পরিবহন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। কখন কিভাবে নৌকা জাতীয় জলযানের সৃষ্টি হয় তা বলা কঠিন। তবে জলের উপর কোন জিনিস ভাসতে দেখেই খুব সম্ভব সেকালের লোক নৌকা জাতীয় জলযান তৈরি করার চিন্তা করেছিল।

সমাজবদ্ধ জীবনের সূচনা ঃ সে যুগের মানুষের ঘরবাড়ি, গ্রাম ও তার সুরক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তা থেকে অনুমান করা যায় যে, বাঁচার তাগিদেই তারা মিলেমিশে কাজ করবার উৎসাহ পেয়েছিল। বেড়া দিয়ে কিংবা গড় কেটে গ্রাম ঘিরে রাখার ব্যবস্থা এক বা দু-এক জনের কাজ নয়। অনেকের আগ্রহ, চেষ্টা ও শ্রম একসঙ্গে মিলিত হলেই দশের উপকারের জন্য এই ধরনের কাজ করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে তৈরি এ যুগের কিছু বড়ো ইমারতও আবিষ্কার করা গেছে। তা দেখেও মনে হয়, একটা সাধারণ উদ্দেশ্যে বহু লোক একসঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিল বলেই এত বড়ো ইমারত তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনা থেকে ঐতিহাসিকেরা মনে করেছেন যে, সেই সুদূর অতীতের প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মানুষ বড়ো রকমের স্বার্থের তাগিদে সমাজবদ্ধ জীবনযাত্রা শুরু করেছিল।

ধর্মবিশ্বাস ও শিল্পচর্চা ঃ ধর্মবিশ্বাস বলতে একালে যা বোঝায়, নব্য প্রস্তর যুগের মানুষদের ধর্মবিশ্বাস ছিল তা থেকে ভিন্ন ধরনের। বুদ্ধি ও অনুভবের ক্ষমতা বাড়বার ফলে এ যুগের মানুষ সকলেই অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। রাজা, পুরোহিত এবং জাদুবিদ্যার অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি অন্ধবিশ্বাস এ যুগের ধর্মচেতনার বড়ো লক্ষণ। এ যুগের মানুষ মৃতদেহকে সাধারণ কবরখানায় অথবা নিজেদের বাড়ির আশেপাশে বা ঘরের নিচে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে কবর দিত। তাদের বিশ্বাস ছিল, মৃতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কবর দিলে মাটিতে ফসলের ফলন বাড়ে। শাস্ত্রীয় আচার অনুসারে কবর দেওয়ার প্রথা নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের জানা ছিল না।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ দিকে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বছর আগে মানুষ প্রথম ছবি আঁকা শুরু করে। ছবি আঁকা দিয়েই মানুষের শিল্পচর্চার সূচনা। তখনও মানুষ বাস করত গুহায়। তাই সেই

সময়কার মানুষেরা 'গুহা মানব' নামে পরিচিত। ফরাসী দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং স্পেন দেশের উত্তরাঞ্চলে এই ধরনের অনেক গুহা আছে। ঐ সমস্ত গুহার দেওয়ালে সেকালের মানুষের আঁকা অনেক রকম ছবি দেখতে পাওয়া গেছে। সেগুলির মধ্যে বেশির ভাগ হচ্ছে মানুষের হাতের ছবি, হাতের চেটোর ছবি, যুদ্ধরত তীরন্দাজ বা শিকারী মানুষের ছবি ইত্যাদি। তবে স্পেনদেশের আলতামিরা গুহায় যে বল্গাহরিণ বা বাইসনের ছবি পাওয়া গেছে, সেটি সে যুগের শিল্পীদের এক বিরাট কীর্তি। ছবিটি চার রকমের



আলতামিরা গুহার বাইসন চিত্র

রঙে আঁকা। নব্য প্রস্তর যুগে এসে মানুষ চিত্রকলার আরও উন্নতি করে। সে যুগে আঁকা নানা জীবজন্তুর ছবি, রঙ-করা নুড়ি পাথর, মাটির পাত্রের গায়ে আঁকা ছবি আগেকার চেয়ে উন্নত ধরনের চিত্রকলার সাক্ষ্য দেয়।

ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষা ব্যবহার ঃ মনের ভাব প্রকাশের সেরা বাহন হচ্ছে ভাষা। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষদের মনের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত কোন ভাষা ছিল না। তারা নানা প্রকার অংগভংগি ও আকার-ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করত। ভয় পেলে বা রাগ হলে চিৎকার করে তা বুঝিয়ে দিত, বড় জোর দু-একটি জিনিসের নাম উচ্চারণ করতে পারত। নব্য প্রস্তর যুগে এসেই মানুষের মুখে কথা ফোটে। মনের ভাব আদান-প্রদানের মতো শব্দ তৈরি করে সে একটা ভাষা গড়ে তোলে। এই যুগের প্রথম দিকে মানুষের শব্দভাণ্ডারে হাজারখানেকেরও কম শব্দ ছিল। কিন্তু এই যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ এখন থেকে আট-দশ হাজার বছর আগে একটি সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষার সৃষ্টি হয়। সেই আদি মানব ভাষার রূপ কেমন ছিল তা জানা যায়

না। তবে এটা বেশ বোঝা যায় যে কতকগুলি ভাষা এক-একটি আদি ভাষা-গোষ্ঠী থেকেই উদ্ভূত।

ফসলের দেবীপূজা ঃ মিশর, সিরিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশে নব্য প্রস্তর যুগের কাদা-মাটিতে তৈরি এবং পাথরে খোদাই-করা ছোট নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। সেই মূর্তিগুলি আসলে দেবীমূর্তি এবং এ'রা **ফসলের দেবী**। যে মাটি-মায়ের গর্ভ থেকে খাদ্যশস্যের অংকুর জন্মায়, তাঁকে দেবীরূপে কল্পনা করে সে যুগের মানুষ মনে করত যে প্রার্থনা করলে তাঁকে খুশী করা যায়, জাদুমন্ত্রোচ্চারণ করে তাঁর শুভশক্তিকে কাজে লাগানো যায়। সমাজে ঘৃণ্য বা পতিত মানুষ নরবলির যোগ্য বলে গণ্য হতো না। সমাজে যাকে লোকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করত এমন কোন অকলংক চরিত্রের যুবককেই বীজ বোনার সময় বলি দেওয়া হতো এবং সে-ও সমাজের চোখে পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠতো।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১. আদিম যুগের মানুষদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
২. জাভা-ম্যান ও পিকিং-ম্যান সম্পর্কে কী জানো বলো।
৩. আদিম যুগের মানুষদের 'খাদ্যসংগ্রহকারী' মানুষ বলা হয়েছে কেন?
৪. প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ যে যে ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার ব্যবহার করত তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৫. প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী সংক্ষেপে বলো।
৬. নব্য প্রস্তর যুগে এসে মানুষের জীবনযাত্রায় যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৭. 'নব্য প্রস্তর যুগীয় বিপ্লব' বলতে কি বোঝ? এই বিপ্লবের প্রকৃতিটি বুঝিয়ে বলো।
৮. নব্য প্রস্তর যুগে কিভাবে সমাজবন্ধ জীবনের সূচনা হয় বিবৃত কর।
৯. নব্য প্রস্তর যুগের ধর্মবিশ্বাস ও শিল্পচর্চা সম্পর্কে যা জানো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

মৌখিক প্রশ্ন

১. আদিম যুগের মানুষদের মধ্যে কারা প্রথম আগুনের ব্যবহার জানতো?
২. কোন্ কোন্ যুগকে অসভ্যতা ও বর্বরতার পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে?
৩. আনুমানিক কতকাল আগে প্রাচীন প্রস্তর যুগের অবসান হয়?
৪. মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুন আবিষ্কারের পরেই কোন্ আবিষ্কারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী?
৫. আলতামিরা গুহায় কিসের ছবি দেখতে পাওয়া গেছে?

তৃতীয় অধ্যায়

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

প্রস্তর যুগ শেষ হবার পর শুরু হয় ধাতু যুগ। প্রস্তর যুগে অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি তৈরির উপকরণ ছিল পাথর। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে পাথরের জায়গা দখল করল ধাতু। তামা, ব্রোঞ্জ এবং লোহা, এর মধ্যে যে সময়-সীমার ভিতরে যে ধাতুর ব্যবহার জীবনযাত্রায় নূতনত্ব নিয়ে এসেছে, সেই ধাতুর নামেই সেই সময়ের নাম রাখা হয়েছে ; যেমন—তাম্র যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগ।

নব্য প্রস্তর যুগের যে বিপ্লবী পরিবর্তন তা ঘটেছিল প্রাগৈতিহাসিক কালের রাতের বেলার আবছা আলোয়। পুরাতত্ত্ব ও অন্যান্য সূত্র থেকে একালের মানুষ সে সময়কার নানা ঘটনা জানতে পেরেছে। ঐতিহাসিকেরা বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে, প্রমাণের সঙ্গে অনুমান মিলিয়ে সে সময়কার একটা ইতিহাস গড়ে তুলেছেন। তা থেকেই মানবসমাজের প্রথম বিপ্লবী পরিবর্তনের কাহিনী জানতে পারা গেছে।

কিন্তু মানবসমাজের দ্বিতীয় বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটেছে একেবারে ঐতিহাসিক কালের ঊষালগ্নে এবং ইতিহাসের অরুণোদয় পর্যন্ত তার জের চলেছে। তাই এই সময় যে সব ঘটনা ঘটেছে তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। এখন থেকে আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে ঐতিহাসিক কালের সূচনা। তারও আগে হাজারখানেক বছরের মধ্যে নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার ফলে মানবসমাজের জীবনযাত্রায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। তখন তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ শুরু হয়ে গেছে। সেই পরিবর্তনকে এক কথায় শহর বা নগর-সভ্যতার বিপ্লব বলে উল্লেখ করা যায়।

পৃথিবীর যে অংশে এই বিপ্লব ঘটে তার চৌহদ্দি হচ্ছে—পূর্বে রাজপুতানার থর মরুভূমি ও হিমালয় পর্বতমালা, পশ্চিমে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি ও ভূমধ্যসাগর, উত্তরে বলকান, ককেশাস, এলবুরজ ও হিন্দুকুশ পর্বত এবং দক্ষিণে কর্কটক্রান্তি রেখা। এই এলাকার জলবায়ু, ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ বিপ্লবী পরিবর্তনের অনুকূল ছিল। এই এলাকার কিছু কিছু স্থানে পাহাড় ও মরুভূমি! কিন্তু এর মধ্যে মধ্যে এবং চারপাশে তৃণঘেরা প্রান্তর। সেখানে স্বচ্ছন্দে গ্রাম গড়ে উঠতে পারে, পশুপালকেরা পশুর পাল চরাতে পারে। ব্রেস্টেড এই বলয়ের পশ্চিম অংশের নাম দিয়েছেন অর্ধচন্দ্রাকার উর্বর ভূখণ্ড (ফার্টাইল ক্রিসেণ্ট)। এই ভূখণ্ডের পশ্চিম প্রান্তে নীলনদের উপত্যকায় মিশর এবং পূর্বপ্রান্তে ইউফ্রেটিস ও

টাইগ্রিস নদীর নিম্ন উপত্যকা। এই অঞ্চলই হচ্ছে প্রাচীন সুমেরীয় (মেসোপটমীয়), ব্যাবিলনীয় এবং আসিরীয় সভ্যতার জন্মভূমি।

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে আসিরিয়ার নিনেভের কাছাকাছি বেশ কয়েকটি গ্রাম ছোট শহরে পরিণত হয়েছিল। এর মধ্যে টেপ গওরা শহরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে মাটির তলা থেকে শহরের যে সমস্ত চিহ্ন পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় শহরটি যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার সাতশ বছর আগে গড়ে উঠেছিল। এটিকেই সবচেয়ে প্রাচীন শহর বলা যায়। এখানে অনেক মন্দির, কবরখানার ধ্বংসচিহ্ন, বেলনাকার সীল, রত্ন, মণি এবং মুদ্রাদির সবচেয়ে পুরনো ছাঁচ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া দক্ষিণ ইরাকে সুমেরীয় অঞ্চলে প্রাচীনকালে আরও কতকগুলি নগর গড়ে উঠেছিল। যেমন, এরিডু, উর, উরুক, লারসা, লাগাশ, নিপপুর, কিশ ও ব্যাবিলন। এগুলির মধ্যে এরিডুই সবচেয়ে প্রাচীন।

উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঃ তামা এবং ব্রোঞ্জ ধাতুর আবিষ্কার এবং নানা কাজে এই নতুন ধাতুর ব্যবহার এ যুগের জীবনযাত্রায় বিরাট এক পরিবর্তন আনে। ব্রোঞ্জ হচ্ছে মিশ্র ধাতু। তামার সংগে টিনের খাদ মিশিয়ে তৈরি হয় ব্রোঞ্জ। আগে পাথর, হাড় কিংবা কাঠ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈরি হতো। ফলে, তা ভেঙে গেলে যেমন জোড়া লাগানো যেত না, তেমনি ধার ক্ষয়ে গেলে অকেজো হয়ে পড়ত। ধাতুর তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির বেলায় ঐ ধরনের অসুবিধে রইল না। সেগুলি আরও মজবুত ও টেঁকসই হওয়ায় এ যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনে সাহায্য করল।

সেকালে **কৃষি বা চাষ-আবাদ ছিল** জীবিকার প্রধান উপায়। লোকে নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই চাষবাস করতে লাগল। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে বলদে-টানা লাঙলের ব্যবহারের ফলে কৃষি-উৎপাদনে বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দেয়। ফালি জমির পরিবর্তে বড়ো আকারের জমিতে কৃষিকাজ শুরু হলো। জমির ফলন বাড়ানোর জন্য গোবরের সার দেবার ব্যবস্থা করা হলো। আগে মেয়েরা নিড়ানি দিয়ে মাটি খুঁড়ে জমিতে চাষ-আবাদ করত। এখন কৃষিকাজে পুরুষেরা এগিয়ে এলো। কিছুসংখ্যক মানুষ ধাতুর কাজে নিজেদের নিযুক্ত রাখায় তাদের জীবন-ধারণের জন্য সমাজে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু পর্যাপ্ত রূপে কৃষিকাজ চালু হওয়ায় সে অভাব সহজেই পূরণ করা সম্ভব হলো।

বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর উদ্ভব ঃ চাষ-আবাদের কাজ কিংবা মাটির কাজ করতে যে ধরনের জ্ঞান-বুদ্ধি লাগে, ধাতুর কাজে তার চেয়ে বেশী জ্ঞান-বুদ্ধির

প্রয়োজন। কারণ, আকরিক ধাতু থেকে তামা বের করা, তামা গালানো, ছাঁচে ঢালাই করে তামাকে ফের শক্ত করা বুদ্ধি ও কৌশলের ব্যাপার। সেইজন্য যারা এই ধরনের কাজে লেগে রইল তারা ধীরে ধীরে এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে এক শ্রেণীর কারিগর হয়ে উঠল। ধাতুশিল্পের বেলায় খনি-শ্রমিক এবং কর্মকার—এই দুশ্রেণীর মানুষকেই বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে।

এই যুগে আরও নানা শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ কারিগর বা শিল্পীর উদ্ভব ঘটে। আগে মাটির পাত্র হাতে তৈরি করা হতো। এখন একটা খাড়া কীলকের (pivot) উপর চাকা বসিয়ে সেই ঘুরন্ত চাকার উপর নরম কাদা রেখে নিপুণ হাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে এক-একটা মাটির পাত্র তৈরি করা সহজ হয়ে গেল। যন্ত্রের সাহায্য পেয়ে মৃৎশিল্পও বিশেষজ্ঞের শিল্প হয়ে উঠল। মৃৎশিল্পী বা কুম্ভকারেরা গ্রামে গ্রামে, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ঘুরে ঘুরে স্থানীয় লোকের চাহিদা অনুসারে জিনিস তৈরি করে দিতে লাগল। সেকালের যে সমস্ত চাকায় তৈরি করা মাটির পাত্র বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেছে তার সবই ভ্রাম্যমাণ বা ভবঘুরে কারিগরদের তৈরি। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে মাটির কাজে চাকার ব্যবহার আসিরীয়া, ইরান প্রভৃতি দেশ থেকে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া সেকালের মানুষ আরও নানা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার ফলে সমাজে স্বর্ণকার, সূত্রধর, কর্মকার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি নানা কারিগরী শিল্পীর উদ্ভব ঘটে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ পণ্যবিনিময় ঃ আজকাল টাকাকড়ি দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন হয়। সেকালে টাকাকড়ি ছিল না। কাজেই পণ্য বিনিময় করেই লেনদেন হতো। বাণিজ্য চলত জলপথে। সাধারণ লোকের কাছে যে সব জিনিসপত্রের চাহিদা বেশী ছিল, লোকে সেই সব জিনিস নিয়ে নৌকা করে নদী বা খাল পথে দূরদেশে বাণিজ্য করতে যেত। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে থেকেই নৌকার ব্যবহার চালু হয়েছিল বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞ শিল্পী ও কারিগরেরা নিজেদের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের সময় পেত না। ফলে তাদের বাধ্য হয়েই খরিদ্দারের উদ্বৃত্ত খাদ্যসামগ্রীর উপর নির্ভর করতে হতো। তারা গৃহস্থের কাজে লাগে এমন জিনিস তৈরি করে তার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করত।

সামাজিক জীবনে পরিবর্তন ঃ শ্রেণীবিভাগ ঃ গোড়ার দিকে লোকে শিকার করে কিংবা চাষ-আবাদ করে জীবন ধারণ করত, তখন সমাজে শ্রেণীবিভাগ ছিল না। কিন্তু ব্যাপক আকারে কৃষিকাজ শুরু হলে এবং লোকে নানা রকমের পেশায় যোগ দিলে শ্রমের বিভাগ হতে লাগল। এর ফলে ধীরে

ধীরে প্রাকৃতিক সমাজে যে সাম্য ছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়ে নতুন সমাজে বৈষম্য এবং শ্রেণীবিভাগ দেখা দিতে লাগল। নতুন নতুন আবিষ্কার সবলের হাতে দুর্বলকে শোষণ করবার হাতিয়ার হয়ে দেখা দিল। এইভাবে সমাজ ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীতে ক্রমশঃ ভাগ হয়ে যেতে লাগল। ব্রোঞ্জ যুগের গোড়ার দিকে মিশরে কয়েকটি সমাধিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ তুলনা করলে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে বিরোধ ঃ কারিগরি শিল্প ছিল এক ধরনের গুপ্ত বিদ্যা। এই সমস্ত শিল্পের কলাকৌশল পিতা থেকে পুত্রে অথবা গুরু থেকে শিষ্যে বর্তায়। এইজন্য কারিগরি শিল্পীরা স্বভাবতই এক-একটা গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং তারা সযত্নে যে যার শিল্পের রহস্যটুকু গোপন রাখবার চেষ্টা করত। এক গোষ্ঠীর লোক অন্য গোষ্ঠীর শিল্পরহস্য জানতে পারুক এটা কোন গোষ্ঠীই চাইত না। এই ধরনের শিল্পরহস্য ফাঁস হবার ঘটনা নিয়ে গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে বিরোধ ও সংঘর্ষ ঘটতে থাকে।

আদিম ধরনের রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঃ গোষ্ঠী বিরোধ বা সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে, সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য সংঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনের তাগিদেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়। প্রায় হাজার পাঁচেক বছর আগে মিশরে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এক অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটে। তার ফলে কারিগরদের জন্য কাঁচামাল যোগানের ব্যবস্থা, লেখার ব্যবহার এবং নানা রকমের বিজ্ঞানচর্চা শুরু হলো, কিন্তু গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিরোধের অবসান হলো না। ফলে মিশরে আদিম ধরনের একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠল।

নদীমাতৃক সভ্যতা উদ্ভবের কারণ ঃ ব্রোঞ্জ যুগেই মানব সমাজ বর্বরতার ধাপ পার হয়ে প্রথম সভ্যতার মুখ দেখল। আদি যুগের সভ্য দেশগুলির পরিচয় নিলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন নদ-নদীর উপত্যকা অঞ্চলেই মানব-সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয় ঘটেছিল। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী, নীল নদ সিন্ধু নদ এবং ইয়াং-সি-কিয়ং নদের উপত্যকাগুলি ছিল মানব-সভ্যতার আদি পীঠস্থান।

ভবঘুরে মানুষ স্থায়ী বসতি গড়ে তোলবার জন্য এমন জায়গা পছন্দ করে নিল যেখানে সহজে জল পাওয়া যায়। চাষ-আবাদের জন্য জলের প্রয়োজন। সেইজন্য মানুষ নদীতীরের উপত্যকাগুলিতে বসবাস শুরু করল। মানুষ যখন শিকারী জীবন ছেড়ে চাষ-আবাদে মন দিল, তখন থেকেই তার সভ্যতার সূচনা। সেই সভ্যতা শতধারায় বিকশিত হয়ে

উঠতে লাগল, যখন সে শহর বা নগর পত্তন করল। দেখা গেছে যে, অবস্থাপন্ন কৃষিজীবী সমাজেই প্রথম শহরের পত্তন হয়েছে এবং সেই শহরে ধীরে ধীরে কারিগরি শিল্প ও চারুকলা জাঁকিয়ে বসেছে।

সামরিক ও শিল্পপ্রধান সভ্যতার জন্য যে যে ধরনের কাঁচামালের দরকার হয়, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী এবং নীল নদের নিম্ন অববাহিকায় তা প্রচুর পরিমাণে সুলভ ছিল। এইজন্য টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকা অঞ্চলে মেসোপটেমিয়ায় এবং নীল নদের উপত্যকায় মিশরে প্রায় একই সময় দুটি মানব সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। তারপর সিন্ধুনদের উপত্যকায় ভারতবর্ষে এবং ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর উপত্যকায় চীনে আরও দুটি সভ্যতার জন্ম হয়। কিন্তু তখন এই দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগের কোন সহজ পথ ছিল না। সেইজন্য এই সমস্ত দেশে সভ্যতার বিকাশের ধারায় যেমন অনেকটা মিল দেখা যায়, তেমনি কিছু কিছু গরমিলও নজরে পড়ে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১. পৃথিবীর যে অংশে শহর বা নগর-সভ্যতার বিপ্লব ঘটেছিল, সেই অংশের চৌহদ্দির বিবরণ দিয়ে একটি প্রাচীন শহরের কথা উল্লেখ করো।

২. তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কিভাবে বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তা আলোচনা করো।

৩. তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে আন্তঃগোষ্ঠী বিরোধ ও আদিম ধরনের রাজ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে যা জানো বলো।

৪. নদীমাতৃক সভ্যতার উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করে কয়েকটি নদীমাতৃক সভ্যতার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করো।

মৌখিক প্রশ্ন

১. প্রস্তর যুগের পর কোন্ যুগ শুরু হয়?

২. পৃথিবীর যে অংশে নগর-সভ্যতার বিপ্লব ঘটে তার নাম কি?

৩. তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের একটি প্রাচীন শহরের নাম বলো।

৪. ধাতুশিল্পের বেলায় কাদের বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে?

৫. কতকাল আগে নৌকার ব্যবহার শুরু হয়েছিল?

৬. কারিগরি শিল্প এক সময় কোন্ ধরনের বিদ্যা ছিল?

৭. মানব-সভ্যতার আদি পীঠস্থানগুলির নাম উল্লেখ করো।

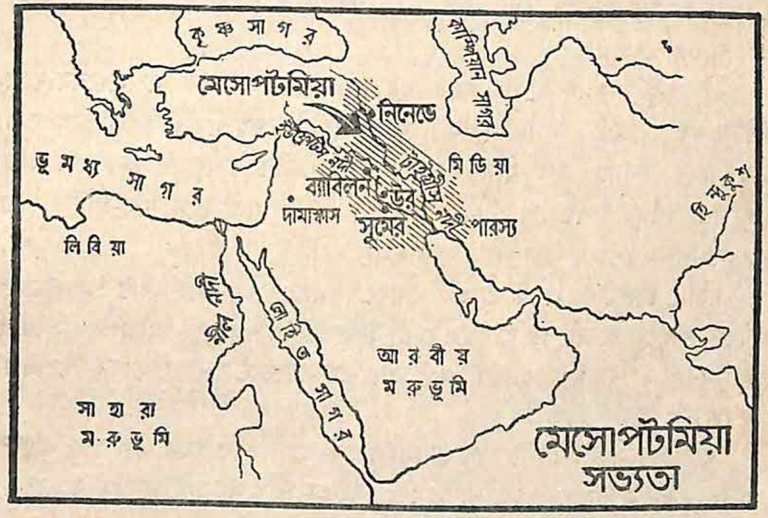
৮. ভারতবর্ষের কোন্ জায়গায় প্রথম সভ্যতার জন্ম হয়?

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম যুগের সভ্যতা

মেসোপটেমিয়া

অবস্থান ও প্রাচীনতা, মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঃ এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝামাঝি উপত্যকায় মানব সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয় ঘটে। গ্রীকরা এই জায়গার নাম রেখেছিল মেসোপটেমিয়া অর্থাৎ দুই নদীর মাঝামাঝি দেশ। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে যে অববাহিকা পারস্য উপসাগর পর্যন্ত চলে গেছে তার নাম ছিল সুমের দেশ। বাইবেলে সুমের দেশকে সিনার



বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুমের অঞ্চলের লোকেরাই মেসোপটেমিয়ার আদি অধিবাসী। সেইজন্য মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতা নামেও পরিচিত। সুমেরের উত্তর দিকের নাম ছিল আক্কাড। এক সময় সুমের ও আক্কাড নিয়ে একটা সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

মানুষ যখন ভবঘুরে জীবন ত্যাগ করে স্থায়িভাবে এক জায়গায় বসবাস করা ঠিক করল, তখন তারা এমন একটা জায়গায় খোঁজ করতে লাগল, যেখানে খাবার জিনিস অঢেল, কোন সময়েই জলের অভাব হবে না, গৃহপালিত পশুর খাদ্য প্রচুর এবং ঘরবাড়ি তৈরির মালমসলাও সহজে মেলে। পারস্য উপসাগরের তীরভূমিতে, বিশেষতঃ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায়

এই সমস্ত জিনিসের প্রাচুর্য ছিল। এইজন্য মেসোপটেমিয়াতেই সবার আগে মানব সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছিল।

জমির উর্বরাশক্তি ও শস্যাদি ঃ মেসোপটেমিয়ার মাটি ছিল টাইগ্রিস ও ইউক্রেটিস নদীর পলি দিয়ে গড়া। জায়গাটা ছিল নলবনে ঘেরা নিচু জলা-জমির দেশ। মাঝখানে কোথাও কোথাও কাদা ও উঁচু বালির ঢিবি। বন্যার সময় এই সব জায়গা জলে ভেসে যেত। তখন কাদা-মাখা জল নলবনের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা খাত বেয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ত। সেই জলের মধ্যে থাকত প্রচুর মাছ। আর নলবনের ঝোপে-ঝাপে বাস করত বুনো মোরগ, শুয়োরের ছানা এবং আরও নানা রকমের প্রাণী। তা ছাড়া সদ্য-জেগে-ওঠা জমিতে অসংখ্য খেজুর গাছ জন্মাত। তা থেকে প্রতি বছর প্রচুর সুমিষ্ট ফল পাওয়া যেত।

এই সেই জায়গা, খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে যাকে নন্দনকানন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানকার মাটিতে আপনা থেকেই গম ও বার্লি জন্মাত। বাঁধ দিয়ে বন্যার জল ধরে রাখতে পারলে, উঁচু জমিতে জলসেচন করে ফসলের পরিমাণ শতগুণ বাড়ানো যেত। এইজন্য এখানে চাষ-আবাদ করে খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করা সহজ হয়েছিল।

বন্যার বিরুদ্ধে সতর্কতা ঃ কখনও কখনও মেসোপটেমিয়ার মানুষদের জীবনে বন্যা অভিশাপের আকারে দেখা দিত। কিন্তু সেই অভিশাপের কাছে হার না মেনে বন্যা নিরোধের জন্য তারা যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করেছিল, তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

বসন্তকালে আর্মেনীয় পর্বতমালা থেকে যখন বরফ গলে জল হয়ে গড়িয়ে পড়ত, তখন এক ধরনের ঢল নামত। সেই ঢলের জল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর কূল ছাপিয়ে দুপাশের উষর জমির তৃষ্ণা মেটাত। ইউফ্রেটিস নদীর জলের গতি ছিল ধীর এবং নিয়মিত। ফলে এই নদীর উপচে-ওঠা জল যখন সমতল ভূমিকে ভাসিয়ে দিত, তখন তা প্রচুর পলিমাটিও ছড়িয়ে দিত। সেই সময় লোকে বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁধ বেঁধে সেই জল ধরে রাখত। পরে কাছাকাছি জমিগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা করত। কিন্তু টাইগ্রিস নদী সমুদ্রের দিকে যত এগিয়েছে তার মুখ তত সরু হয়ে এসেছে। ফলে তার জলের বেগ ধারণ করবার ক্ষমতাও কমে গিয়েছে। এইজন্য পূর্ব এবং উত্তর দিক্‌কার পর্বতমালা থেকে বরফ-গলা জলে যখন টাইগ্রিসের বুকে প্রবল ঢল নামত, তখন তা ভয়াবহ বন্যার আকারে সমতলভূমি ভাসিয়ে দিয়ে সেখানকার উর্বর মাটি ধুয়ে মুছে নিত।

এই বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা করতে না পারলে দেশের সর্বনাশ অনিবার্য। তাই মেসোপটেমিয়াবাসীরা মাথা খাটিয়ে আত্মরক্ষার উপায় বের করল। প্রথম কাজ হলো জলস্রোতের গতিকে রোধ করা ; দ্বিতীয় কাজ, খাল কেটে বন্যার জল আটক করে রাখা। তাই মেসোপটেমিয়ায় ছোট বড়ো বহু পুরনো খাল, বাঁধ এবং গড় দেখতে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া তখন পাম্প করে জল নিকাশের ব্যবস্থা ছিল। নিয়মিতভাবে পাঁক উঠিয়ে যে খালগুলির গভীরতা কমতে দেওয়া হতো না, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অন্যান্য উপজীবিকা ঃ খাদ্যসামগ্রীর খোঁজে উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম দিকের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে নানা জাতের মানুষ মেসোপটেমিয়ার সমতল ভূমিতে নেমে এল। এদের মধ্যে সবচেয়ে আগে যারা আসে তারা সুমেরীয় নামে পরিচিত। তাদের গায়ের রং ছিল তামাটে এবং নাক উঁচু। সুমেরীয়রা এখানে এসে ধীরে ধীরে একটা প্রাচীন সভ্যতা গড়ে তোলে।

মেসোপটেমিয়ার মানুষদের প্রধান পেশা ছিল কৃষি। সাধারণ মানুষের একটা বড়ো অংশ চাষ-আবাদ নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকত। এ ছাড়া অন্যান্য পেশার লোকজনও কিছু কম ছিল না। একদল লোক খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা, জলনিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজ করত। আর একদল লোক চাষবাসের জিনিসপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরির কাজ নিয়ে থাকত। মেসোপটেমিয়ার জমি ছিল পলিমাটিতে তৈরি। সেইজন্য সেখানে চকমকি বা অন্য কোন রকমের পাথর কিংবা কাঠের গুঁড়ি কিছুই পাওয়া যেত না। অথচ ঘরবাড়ি তৈরি করতে হলে এ সমস্ত জিনিসের খুবই প্রয়োজন। তামা এবং ব্রোঞ্জের প্রয়োজনও কম ছিল না। এ জন্য এই সমস্ত জিনিস বাইরে থেকে আমদানি করা হতো। একদল লোক এই ধরনের আমদানি কাজে ব্যস্ত থাকত। কিছু লোক ইট এবং মাটির পাত্রাদি তৈরির কাজ নিয়ে থাকত। কৃষক, শ্রমিক, বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিল্পী, পরিবহন কর্মী,—সব মিলিয়ে মেসোপটেমিয়ায় নানাপ্রকার বৃত্তিজীবী মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল।

সুমেরীয়দের অবদান ঃ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে যে শহর সভ্যতার বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে, মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয় সভ্যতার আমলে তার চেহারাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ধাতুবিদ্যায় দখল, চাকা, বলদে-টানা গাড়ি, মালবাহী গাধা, পাল-তোলা জাহাজ—সব মিলিয়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লবের পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া সুমেরীয়রাই পৃথিবীতে প্রথম সত্যিকার শহর গড়ে তুলেছিল। কিন্তু এদের মধ্যে ছিল এক ধরনের

আদ্যিকালের ধর্ম-বিশ্বাস। সেইজন্য সুমেরীয়দের জীবনে মন্দির, দেবতা এবং পুরোহিতদের স্থান ছিল খুবই উঁচুতে।

মনোরম ইমারত, কাদামাটির ইটে তৈরি মন্দিরসমূহ ঃ দুর্গের মতো প্রকাণ্ড মনোরম ইমারত গড়তে ও কাদামাটির ইট দিয়ে মন্দির তৈরি করতে সেকালের সুমেরীয়দের জুড়ি ছিল না। প্রত্যেক শহরেই এইরকম একাধিক মন্দির এবং অন্ততঃ একটি করে প্রকাণ্ড ইমারত থাকত। এই ধরনের ইমারতের নাম ছিল জিগ্‌গুরাত। নিপ্‌পুর, উরুক, উর প্রভৃতি শহরের বড়ো বড়ো জিগ্‌গুরাতগুলি দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর ছিল। জিগ্‌গুরাত আসলে এক রকমের মন্দির। তবে চেহারাটা কৃত্রিম পাহাড়ের মত। একটা চারকোণা ভিত্তির উপর থেকে জিগ্‌গুরাত থাকে থাকে ক্রমেই আকারে ছোট হতে হতে উপরের দিকে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। জিগ্‌গুরাত তিনতলা থেকে সাত-আটতলা পর্যন্ত উঁচু হতো। এর লাগোয়া সিঁড়ি বেয়ে উপর তলা পর্যন্ত উঠে যাওয়া যেত। একেবারে উপরে মন্দিরের মত ঘর থাকত। সেখানে বসে পুরোহিতেরা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন।

মন্দিরগুলি কাদামাটির ইটে তৈরি হলেও আগে থেকে নিখুঁত নক্‌শা করে নিয়ে তবে গাঁথনির কাজ শুরু করা হতো। এ কাজ দুচার জনের দ্বারা সম্ভব ছিল না। অনেক লোক একত্র হয়ে মন্দির গাঁথার কাজে লেগে যেত। সুমেরীয়দের বিশ্বাস ছিল মন্দিরের নক্‌শা দেবতারা নিজেরা এসে ঠিক করে দিতেন। কিন্তু আসলে নক্‌শা আঁকতেন পুরোহিতেরাই।

দেওয়াল চিত্র (ফ্রেস্কো) ঃ মন্দিরের বাইরের ও ভিতরের দেওয়ালগুলি নানারকমের ছবি এঁকে সাজানো হতো। দেওয়ালের গায়ে একরকমের প্রলেপ (প্লাস্টার) লাগিয়ে তার উপর ছবি আঁকা হতো। ইংরেজিতে এই ধরনের দেওয়াল-চিত্রকে ফ্রেস্কো পেন্টিং বলা হয়। মেসোপটেমিয়ার পুরনো মন্দিরের দেওয়ালে পাকা হাতে আঁকা এই রকমের অনেক ছবি দেখতে পাওয়া গেছে। কোন কোনটিতে ছাগল, খাঁচায় আটক-করা সিংহ প্রভৃতি জীবজন্তুর ছবিও দেখা গেছে। এই সব থেকে মনে হয়, সুমেরীয়দের চিত্রশিল্পে বেশ দখল ছিল।

পাথর-কাটাই ঃ পলিমাটির দেশ মেসোপটেমিয়ায় পাথর মিলত না। সেইজন্য গোড়ার দিকে এখানে পাথরের ব্যবহার ছিল খুবই কম! তাই বড়ো বড়ো ইমারতের থাম ইট দিয়ে তৈরি হতো। আর অলংকরণের কাজে একধরনের আস্তর (স্টাকো) এবং পোড়ামাটির সাজের (টেরাকোটা) ব্যবহার ছিল বেশী। বিদেশ থেকে যে সামান্য পরিমাণ পাথর আমদানি করা হতো তা বিশেষ

কাজে ব্যবহার করা হতো। এই সময়ের খণ্ড খন্ড করে কাটা কিছু কিছু পাথরের ফলক দেখতে পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে হয় সুমেরীয়রা কোন রকমের ধারালো অস্ত্র দিয়ে পাথর কাটার কৌশল জানত। খ্রীষ্টপূর্ব দুই সহস্রাব্দের মধ্যে তৈরি পাথরের থাম টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় দেখতে পাওয়া গেছে। মনে হয়, মিশরের সঙ্গে যোগাযোগের পর থেকে এই অঞ্চলে পাথরের ব্যবহার বেড়ে যায়।

ধাতুবিদ্যা ঃ সুমেরীয়রা ধাতুবিদ্যাতেও বেশ পটু ছিল। পলিমাটিতে গড়া সমতল ভূমিতে জীবনযাত্রা যাতে আরও স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর হয়, সেইজন্য সুমেরীয়রা বিদেশ থেকে নানা রকমের ধাতু আমদানি করা শুরু করে। এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেই মেসোপটেমিয়ার শহরবাসীর কাছে তামা ও ব্রোঞ্জ দরকারী জিনিস হয়ে ওঠে। সে সময় মন্দিরগুলি ছিল



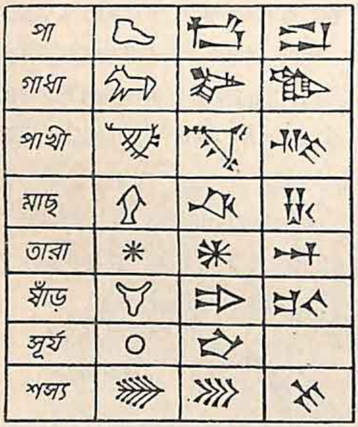
গ্রামীন সুমেরীয় যুদ্ধরথ

'দেবতাদের সংসার'-এর মত। সেই সমস্ত দেবতাদের সংসার সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি দামী ধাতুর দরকার হতো। নানা জায়গায় ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে এই সমস্ত ধাতু দিয়ে তৈরি বহু জিনিস পাওয়া গেছে। এ দেখে মনে হয়, এগুলি নিয়মিতভাবেই আমদানি করা হতো। তা ছাড়া এই সব ধাতু গালিয়ে, পিটিয়ে নানা রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরির কলাকৌশলের উপরেও সুমেরীয়দের বেশ দখল ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে রথের ব্যবহার হত।

পরিবহন ব্যবস্থা ও বাণিজ্য ঃ জল ও স্থল—উভয় পথেই পরিবহন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। চাকাওয়ালা টানা গাড়িতে স্থলপথে মাল চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল। সওদাগরেরা এই ধরনের ঢাকনাওয়ালা গাড়িতে মাল বোঝাই করে মরুভূমি ও পাহাড়ী এলাকা পার হয়ে দূরদেশে বাণিজ্য করতে যেত। আবার

ছোট ছোট বাণিজ্যতরীর বহর নিয়ে বণিকেরা কখনও কখনও পারস্য উপসাগর বা আরব সাগরের পথে ব্যবসা বাণিজ্য করতে আসত।

সুমেরীয়দের বাণিজ্যের এলাকা ছিল বহু দূরে ছড়ানো। তবে বাণিজ্যের মধ্যে রপ্তানির চেয়ে আমদানির ভাগ ছিল বেশী। যেমন, বেশির ভাগ তামা আমদানি হতো পারস্য উপসাগরের তীর থেকে; টিন আসত ইরান, সিরিয়া, প্রভৃতি দেশ থেকে; রূপো ও সীসে, তরাস পার্বত্য অঞ্চল থেকে; নীলা পাথর উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তান থেকে; পারস্য উপসাগরের কূল থেকে আমদানী হতো মুক্তো-ভরা ঝিনুক। সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে কবচ, জপের মালা, এমনকি যার উপর কুমোরের চাক বসানো হয়, সেই জিনিসও আমদানি করা হতো। দেশের শিল্পজাত সামগ্রীও বাইরে রপ্তানি করা হতো। বিনিময়ের সূত্রেই মালপত্র বেচাকেনা চলত। মাল চলাচলের উপর মাশুল আদায়ের জন্য এক শ্রেনীর আধা-স্থায়ী সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত ছিল বলেও জানা যায়।



বাণমুখো বা কীলোকাকার লিপি

লিপি ঃ মানুষের চিন্তা ও অনুভবের ক্ষমতা বাড়বার সংগে সংগে মনের কথাকে বহুলোকের কাছে বলবার এবং নিজেকে প্রকাশ করবার তাগিদ থেকেই লিপির জন্ম হয়েছে। মানুষের প্রথম লিপি হচ্ছে **চিত্রলিপি**। ছবি এঁকে, তখন মনের ভাব, কোন ঘটনা বা বিশেষ কোন বস্তুকে বুঝিয়ে দেওয়া হত। দেশ-বিদেশের পাহাড়ের গুহার গায়ে দশ-বারো হাজার বছর আগেকার মানুষের আঁকা এমন অনেক ছবি দেখতে পাওয়া গেছে। এর পরে এল **ভাবলিপি**। বস্তুকে দেখা যায়, দেখানোও যায়। কিন্তু সুখ, দুঃখ, রাগ, বিরক্তি, উদ্বেগ প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবগুলিকে দেখাও যায় না, দেখানোও যায় না। অথচ এগুলি বাদ দিয়েও জীবন হয় না। লোকের কাছে বোঝাতে হলে এগুলিকে রূপ দিয়ে বাইরে প্রকাশ করা দরকার। এই ধরনের প্রয়োজন থেকেই ভাবলিপির সৃষ্টি। যেমন, চোখের রেখা এঁকে তা থেকে জল ঝরছে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া মনে দুঃখের ভাব রয়েছে।

এই ভাবে ধাপে ধাপে লিপির রূপ বদল হতে হতে সুমেরীয় লিপির জন্ম হলো। এ পর্যন্ত যে সমস্ত পুরনো লেখার নমুনা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সুমেরীয় লিপিই সবচেয়ে পুরনো বলে জানা গেছে! সুমেরীয় লিপির নাম **বাণমুখো** বা **কীলোকাকার লিপি** (কিউনিফর্ম স্ক্রিপ্ট)। নরম কাদা-মাটির চাকতির উপর নলখাগড়া বা ঐ ধরনের কোন শক্ত ছুঁচালো জিনিসের মুখ দিয়ে বাণ বা কীলোকের আকারে লেখা হতো বলে সুমেরীয় লিপির এই রকম নাম হয়েছে। এও অবশ্য এক রকমের চিত্রলিপি। সুমেরীয়রা এই লিপি দিয়ে নিজেদের ভাষা লিখত। সুমের থেকে এই লিপি কালে কালে আক্কাড, ব্যাবিলনিয়া, আসিরিয়া প্রভৃতি দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

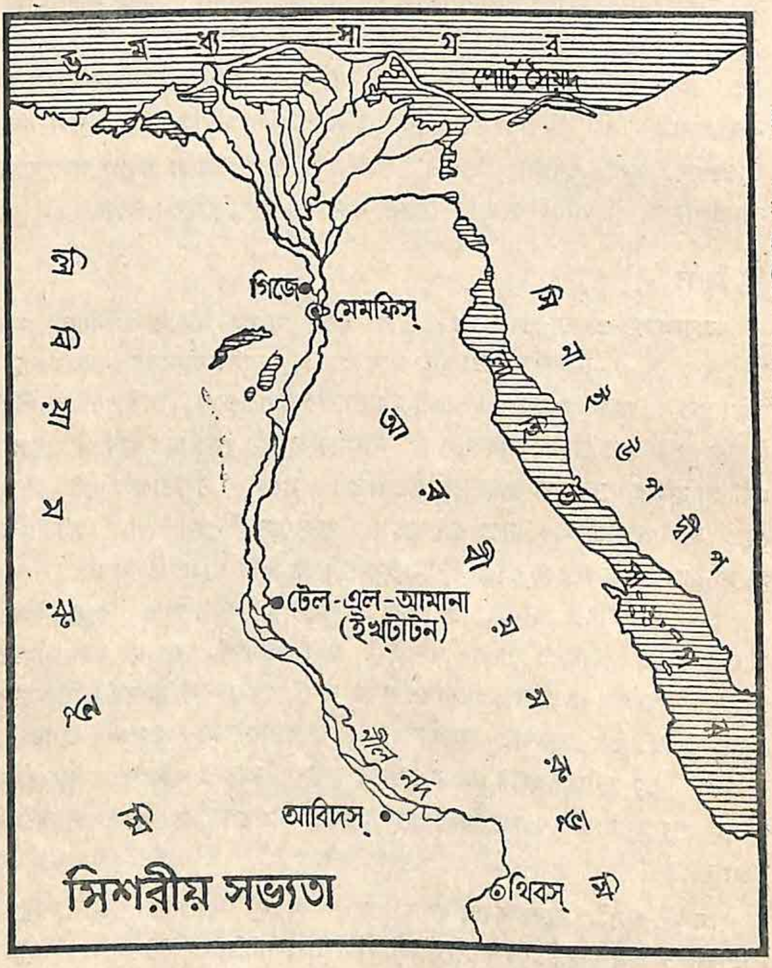
● মিশর

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি: প্রায় একই সময়ে মেসোপটমিয়ার মত মিশরে আর একটি মানব সভ্যতার জন্ম হয়। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে আফ্রিকা মহাদেশ। এই মহাদেশের উত্তরাঞ্চলে নীলনদের সংকীর্ণ উপত্যকায় মিশর দেশের অবস্থান। নীলনদ লম্বায় প্রায় চার হাজার মাইল। মধ্য আফ্রিকার হ্রদগুলি থেকে এর উৎপত্তি। সংকীর্ণ উপত্যকার দুই পাশে ছোট ছোট পাহাড় একে ঘিরে রেখেছে। পাহাড়ের পিছন দিকে সীমাহীন মরুভূমি। এই পাহাড়-ঘেরা নদীমাতৃক দেশের মাটি খুবই উর্বর।

মেসোপটমিয়ার পরিবেশের সঙ্গে এখানকার পরিবেশের কিছু কিছু মিলও আছে। মিশর ছিল এক রকম জল জঙ্গলের দেশ। জলাজমিতে প্যাপিরাস গাছের ঝাড়, তার মধ্যে জলো মোরগ, আরও নানা রকমের শিকারের যোগ্য পাখি এবং ভয়ঙ্কর জলহস্তীর (হিপোপটেমাস) বাস। উপত্যকা ভূমিতে বাড়ি তৈরি করবার মত কাঠ কিংবা ধাতুর অভাব থাকলেও মরুভূমি অঞ্চলে কুড়ুল বা ছুরি কাটারি তৈরি করবার মত চকমকি পাথরের অভাব ছিল না।

মিশরকে **নীল নদের কন্যা** বলা হয়। কারণ, মিশরের মাটির উর্বরতা নীলনদেরই দান। প্রতিবছর বরফ-গলা জল এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টির জলের দরুন নীলনদে বন্যা দেখা দিত। ফলে নীলনদের দুই তীরের জমিগুলি জলে ডুবে যেত। কিন্তু জল যখন নেমে যেত তখন পলিমাটি পড়ে মিশরের জমি খুব উর্বর হয়ে উঠত। তা ছাড়া অসংখ্য খাল কেটে বন্যার জল ধরে রাখা হতো এবং প্রয়োজনের সময় সেই জল ছেড়ে দিয়ে চাষের জমিতে সেচের কাজ করা হতো। এইজন্য সুদূর আফ্রিকা অঞ্চল, আরবের মরুভূমি-অঞ্চল এবং এশিয়া

মহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে মিশরে লোকে এসে ভিড় করতে থাকে। এইভাবে জীবিকা ও জীবন ধারণের প্রয়োজনে মিলিত বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর চেষ্টায় এখানে একটা নতুন সভ্য জাতি গড়ে ওঠে।



মিশরীয় সভ্যতা

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা যখন খাদ্য সংগ্রহের জন্য দীর্ঘসময় ব্যয় করত, তখন মিশরের একজন কৃষক বা শহরের কোন মানুষ জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করেও দৈনিক কিছু অবসর সময় পেত। এই অবসর সময়টাকে তারা জীবিকা সংগ্রহের চেয়ে বড়ো ধরনের কাজে লাগাতে থাকে। মিশরীয় সভ্যতার মূলে এটাও ছিল একটা বড়ো সুযোগ।

ফ্যারাও ও পুরোহিত সম্প্রদায় ঃ অতি প্রাচীনকালে মিশর উত্তর এবং দক্ষিণ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্য আবার কতকগুলি জেলা বা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় তিন হাজার দুশ বছর পূর্বে মেনেস নামে একজন শক্তিশালী রাজার অভ্যুদয় ঘটে। মেনেস প্রথমে ছিলেন মিশরের দক্ষিণ রাজ্যের রাজা। তিনি উত্তর রাজ্যকে জয় করে দুই রাজ্যকে এক করে নিজে গোটা মিশরের রাজা হয়ে বসেন। মেনেস হলেন মিশরের প্রথম রাজবংশের প্রথম রাজা।

সমগ্র মিশরের রাজা হয়ে মেনেস মেমফিস অঞ্চলে একটি সুরক্ষিত নগরী তৈরি করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। মেমফিস ছিল উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্য দুটির সীমান্তে অবস্থিত। সেইজন্য এখান থেকে সারা দেশে শাসন পরিচালনার সুবিধা ছিল। সমগ্র দেশ এক হবার পরেও মেনেস জেলাগুলির পৃথক অস্তিত্ব লোপ করে দিলেন না। প্রত্যেক জেলায় একজন করে আঞ্চলিক শাসক নিযুক্ত করে প্রশাসনের ভার তার হাতে তুলে দিলেন।

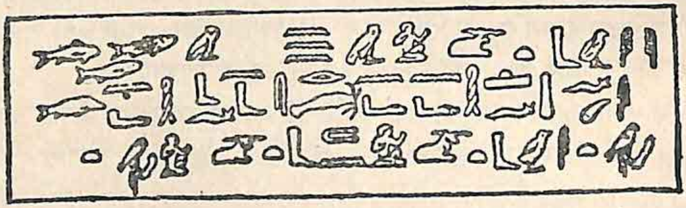
মেনেসের সময় থেকে পর পর একত্রিশটি রাজবংশের রাজা মিশরে রাজত্ব করেন। মিশরের রাজারা ফ্যারাও নামে পরিচিত ছিলেন। ফ্যারাও কথাটির অর্থ হচ্ছে 'যে মানুষ বড়ো বাড়িতে বাস করেন'। প্রাচীন মিশরের ফ্যারাও বা রাজারা দেবতার মত পূজিত হতেন। মেনেসের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ থেকে চতুর্থ রাজবংশের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়কে 'প্রাচীন রাজ্য' বলা হয়। চতুর্থ রাজবংশের আমল থেকে মিশরের গৌরবের সূচনা।

মিশরীয়দের জীবিকার চিন্তা ছাড়াও ধীরে ধীরে তাদের মনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা প্রশ্ন দেখা দিতে লাগল। আকাশে যে অগুণতি তারা রয়েছে ওরা কোথা থেকে এল ? বজ্রের গর্জন অমন ভয়ংকর হলো কার চেষ্টায় ? নীল নদের বুকে যে বন্যা নামে, সেই বন্যার জলের বাড়া-কমাকে এমন নিয়মের সূত্রে বেঁধে দিল কে ? ব্যাধি ও মৃত্যু মানুষকে ঘিরে রেখেছে তবু মানুষ সুখী হয়, তার মুখে হাসি ফোটে—এর কারণ কী ? সাধারণ মানুষের মনে এই ধরনের নানা প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল। এক শ্রেণীর মানুষ এই সমস্ত জিজ্ঞাসার যথাসাধ্য উত্তর দেবার জন্য এগিয়ে এল। মিশরীয়েরা তাদেরই নাম দিল পুরোহিত। এই পুরোহিতশ্রেণী জনসাধারণের চিন্তার জগতের অভিভাবক হয়ে সমাজে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন।

লিপি ও লিপিলেখক বা করণিক ঃ মেসোপটমিয়া বা প্রাচীন সুমের দেশে চিত্রলিপি উদ্ভবের কিছুকাল পরে মিশর দেশেও লেখার প্রচলন হয়। মিশরীয়েরা মন্দিরের দেওয়ালে এবং কবরের উপর খোদাই করে নানা রকমের

ছবি এঁকে তাদের চিন্তাধারাকে স্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা করত। তাদের লেখা অনেক পুঁথিপত্র পাওয়া গেছে। পুঁথিগুলি গুটানো অবস্থায় থাকত। নীল নদের তীরে শোলার মত একরকম গাছ জন্মাত, তার নাম 'প্যাপিরাস'। এই গাছের ডাঁটা দিয়ে একরপ্রকার কাগজ তৈরি করে তার উপরে কালি দিয়ে লেখা হতো। চিত্রলিপির সাহায্যে তারা তাদের মনের ভাব, মুখের কথা প্রকা করত। মিশরীয় এই চিত্রলিপিকে **চিত্রাক্ষর** বা **হায়ারোগ্লিফিকস্** বলা হয়। এই কথাটির অর্থ পবিত্রলেখা।

লিপির উদ্ভবের ফলে লেখার জন্য একদল লোকের প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবে সমাজে লিপিলেখক বা করণিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ঐতিসাহিক উইল ডুরাণ্ট-এর বর্ণনায় দেখা যায়—লিপিলেখকগণ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে উবু



হায়ারোলিফিকস্ চিত্রলিখন

হয়ে বসে রয়েছে। গায়ে সাজপোশাক নেই তবে হাতে একটা কলম, কানের পিছনে আর একটা কলম। লিপিলেখক নানা শ্রেণীর কর্মীদের কাজকর্ম এবং খরচপত্রের হিসাব লিখে রাখত। কাজকর্মে লাভ-লোকসানের হিসাব ঠিক রাখাও ছিল এদের কাজ। কসাইখানায় কটা পশু পাঠানো হলো, বিক্রীর জন্য গুদাম থেকে কত মাল বেরিয়ে গেল, লিপিলেখকদের এই সব হিসাব রাখতে হতো। এ ছাড়া চুক্তিপত্র বা অন্য রকমের দলিলও তৈরি করে দিতে হতো। মোটের উপর, প্রায় সব রকমের লেখার কাজের ভার ছিল তাদের উপর। লিপি-লেখকদের খাটনি ছিল খুব বেশী অথচ জীবনটা ছিল একঘেয়ে। আনন্দের সুযোগ তাদের জীবনে খুব কমই ছিল।

শুল্ক-আদায়কারী এবং সৈনিকগণ (শ্রমিকগণ)ঃ কৃষি এবং বাণিজ্য, দুই জায়গা থেকেই শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। কৃষকের ভাগ্য ছিল খুব কঠিন। শুল্ক-আদায়কারীরা জোর জুলুম করে কৃষকদের কাছ থেকে জমির ফসলের অনেকটা শুল্ক বাবদ আদায় করত। ব্যবসা-বাণিজ্য চলত পণ্যবিনিময় প্রথায়। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক আদায়ের

কড়া ব্যবস্থা ছিল। রাজকোষে আয় বাড়াবার একটা বড়ো সূত্র ছিল আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য থেকে শুল্ক (কাস্টমস্ ডিউটি) আদায়। কেউ যাতে শুল্ক ফাঁকি দিতে না পারে, সেজন্য নিয়মিতভাবে শুল্ক-আদায়কারী নিয়োগ করে সে দিকে নজর রাখা হতো। তখনও মুদ্রার চলন হয় নি। সেইজন্য শুল্ক হিসাবে জিনিসপত্র আদায় করা হতো। এইভাবে সে সময়কার ফ্যারাওদের সরকারী কোষাগার হাজার রকমের পণ্যদ্রব্যে ভরা থাকত।

ফ্যারাওদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল। সৈন্যদের বেশির ভাগ ছিল তীরন্দাজ। তারা মাটিতে দাঁড়িয়ে অথবা রথে চড়ে যুদ্ধ করত। সেইজন্য তাদের দুভাগে ভাগ করা যায়। যারা মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করত, তাদের বলা হত অনারূঢ়, আর যারা রথ বা অন্য কোন কিছুর উপর উঠে যুদ্ধ করত, তাদের বলা হত আরূঢ়।

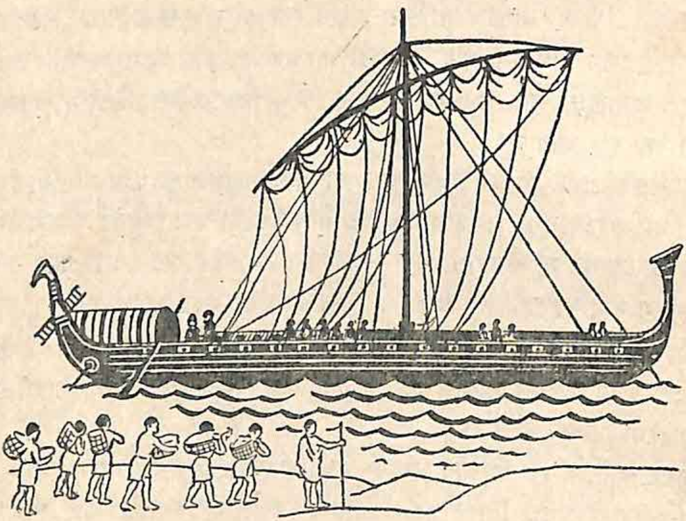
মিশরীয় শ্রমিক ও কর্মীদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল স্বাধীন মানুষ, কিছু কিছু ছিল ক্রীতদাস। ভারতবর্ষের মত মিশরেও বিভিন্ন পেশার মানুষ নিয়ে এক-একটা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, ছেলেরা বাবার পেশা গ্রহণ করবে এটাই ছিল সাধারণ প্রথা। শ্রমিকেরা নানারকম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকত। স্বাধীন কারিগরেরা একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে একত্রিত হয়ে কাজ করত। তারা শ্রমের বিনিময়ে মজুরী পেত। সৈনিকদের মত তাদের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ রাজবংশের রাজত্বকালে মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি হয়। মিশর বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করত এবং বিদেশে নিজেদের তৈরি জিনিস রপ্তানি করত। সিরিয়া এবং ক্রীট দ্বীপ থেকে সওদাগরেরা মিশরের বাজারে এসে ভীড় জমাত। বাণিজ্যের মধ্যে অবশ্য রপ্তানির চেয়ে আমদানির ভাগ ছিল বেশী। সিনাই থেকে তামা, লিবিয়া থেকে সোনা, আরব অথবা সোমালিল্যান্ড থেকে মসলাপাতি এবং সুগন্ধ দ্রব্য, এশিয়া থেকে নীলা পাথর প্রভৃতি আমদানি করা হতো। এ ছাড়া মিশরীয় শিল্পীদের তৈরি শিল্প-সামগ্রী ক্রয় করবার জন্য সিরিয়া, সাইপ্রাস ও ক্রীট দেশ থেকে ব্যবসায়ীগণ মিশরের বাজারে এসে ভীড় করত। বিরাট জাহাজ মালপত্র নিয়ে লোহিত সাগর, নীলনদ ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যাতায়াত করত। স্থলপথে ব্যবসা চলত গাধা বা ঘোড়ার পিঠে।

বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বিষয়ে মেসোপটামিয়ার সওদাগরদের যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা ছিল, মিশরে তা ছিল না। মিশর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিদেশে অভিযান পাঠানো হতো। বড়ো বড়ো সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে

অভিযাত্রী দল গড়া হতো। দেশের ভিতরে পণ্য উৎপাদনে মন্দাভাব ছিল বলে সামান্য কয়েকটি তৈরি জিনিস নিয়ে রপ্তানী-বাণিজ্য চলত। গ্রামের বাজারে বেচাকেনা চলত বিনিময়ের মাধ্যমে। দেশে তৈরি শিল্পসামগ্রীর একচেটিয়া মালিকানা ছিল সরকার ও ধনী লোকেদের হাতে।

ফ্যারাওদের সমাধিস্তম্ভের গায়ে আঁকা বাজারের দৃশ্য থেকে সে যুগের মূল্যমানের ধারণা পাওয়া যায়, একটা মাছের বিনিময়ে একটা পাত্র, এক আঁটি পেঁয়াজের বিনিময়ে একখানা পাখা এবং এক বয়ম ভরতি মলমের বিনিময়ে

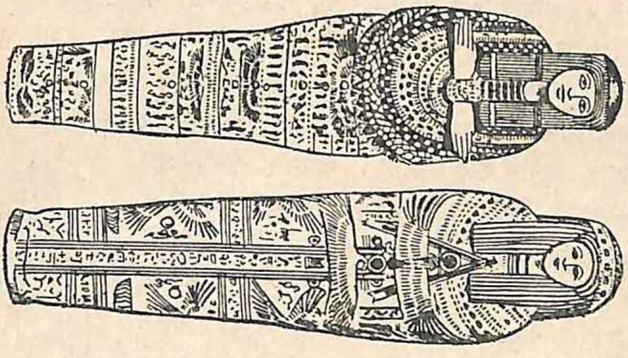


মিশরের বন্দরে পণ্যবাহী জাহাজ

একটা কাঠের বাক্স বিক্রি হতো। তবে মূল্যমান হিসাবে সোনা ও তামার প্রচলনও ছিল এবং কোন কোন লেনদেন যে সোনা ও রূপোর বিনিময়ে হতো তার প্রমাণও পাওয়া গেছে।

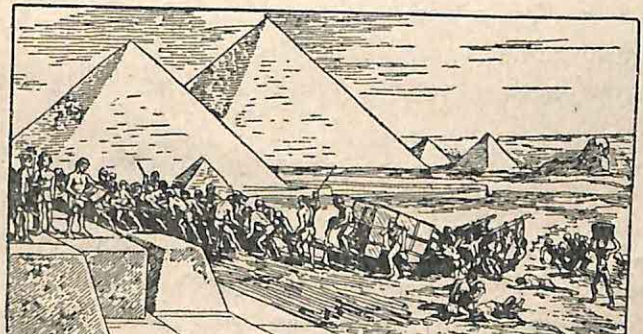
পিরামিডসমূহ ঃ পুরনো পৃথিবীর যে সাতটি বিস্ময়কর বস্তুকে একত্রে সপ্তাশ্চর্য বলা হয়ে থাকে, সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে মিশরের পিরামিড। পিরামিড আসলে সমাধি-মন্দির এবং বিশেষ করে তা রাজরাজড়াদেরই সমাধি। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল, আত্মা অমর। কিন্তু দেহ না থাকলে মৃত্যুর পর কারও আত্মা মহান দেবতা অসিরিসের দরবারে যেতে পারে না। তাই তারা মৃতদেহগুলিকে অবিকৃত রাখবার চেষ্টা করত। এজন্য বুদ্ধি খাটিয়ে তারা একটা অদ্ভুত উপায় বের করেছিল। কেউ মারা গেলে তার আত্মীয়স্বজন

সেই মৃতদেহকে কয়েক সপ্তাহ মলমের মত একটা জিনিসের মধ্যে ভিজিয়ে রাখত। তারপর সেটিকে দামী কাপড়ে জড়িয়ে একটা বিশেষভাবে তৈরি শবাধারে শুইয়ে কবরের গর্তে রেখে দিত। এইভাবে টিকিয়ে-রাখা মৃতদেহকে বলা হতো ম্যমি। পরলোকে গিয়ে মৃতের আত্মার কোন রকম কষ্ট না হয়, সেজন্য মিশরীয়েরা ম্যমির সঙ্গে নানারকম খাদ্যসামগ্রী, গহনা, আসবাবপত্র, গান-বাজনার যন্ত্রপাতি, রাঁধুনী ও নাপিতের ছোট ছোট পাথুরে মূর্তি



ম্যমি

দিয়ে দিত। কিন্তু অনেক সময় বুনো জন্তুজানোয়ার এসে কবর ভেঙে ম্যমিকে অপবিত্র করত কিংবা ডাকাতেরা এসে কবর খুঁড়ে দামী জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যেত। এই জন্য মিশরীয়েরা কবরের উপর প্রথমে ছোট ছোট ঢিবি তৈরি করতে শুরু করে। এই ধরনের ঢিবিই পিরামিডের আদিরূপ।



পিরামিডের কাজে শ্রমিকগণ

চতুর্থ রাজবংশের সবচেয়ে নাম-করা রাজা ছিলেন খুফু। গ্রীকরা এঁকে খেঅপ্‌স্‌ বলত। মিশরের গীজা প্রান্তরে রাজা খুফুর আমলে গড়া পিরামিডটি গ্রেট পিরামিড নামে বিখ্যাত। গ্রীক ঐতিহাসিকের মতে, এটি গড়ে তুলতে এক লক্ষ মানুষের কুড়ি বছর সময় লেগেছিল। গীজা প্রান্তরে এই প্রকাণ্ড পিরামিডের দক্ষিণে একটা অদ্ভুত মূর্তি আছে। তার নাম 'স্ফিংক্স'। এটি রাজা খেফেরেনের আমলে তৈরি হয়। এটি একটি নরসিংহ মূর্তি। এর মাথার দিক মানুষের মত, ধড়ের দিকটা সিংহের মত।

ধর্মবিশ্বাস ঃ মিশরীয়রা প্রকৃতির উপাশক ছিলেন। সব কিছুর মূলে ছিল তাদের প্রবল ধর্মবিশ্বাস। সেইজন্য মিশরের সাহিত্যে, শিল্পকলায় ও সরকারী প্রশাসনে ধর্মের প্রভাব ছিল অমোঘ। যেমন ছিল তার বৈচিত্র্য, তেমনি তার প্রাচুর্য। আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র—সকলেই ছিলেন মিশরীয়দের কাছে এক-একজন দেবতা। এছাড়া, মিশরীয়েরা কুমীর, বাজপাখি, গরু, রাজহাঁস, ছাগল-ভেড়া, শিয়াল-কুকুর, সাপ প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারদের দেবতা মনে করে পূজা করত। এদের মধ্যে কোন কোন জন্তুকে অবাধে মন্দিরের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেওয়া হতো। লোকসমাজে এই সমস্ত পশুদেবতাদের খুব জনপ্রিয়তা ছিল।



মিশরীয় দেবতা

সমস্ত দেবতার মধ্যে সূর্য ছিলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা। আলো ও উত্তাপের দেবতা হিসাবে তাঁর নাম ছিল 'রা' বা 'রে'। আবার কখনও তিনি বাজপাখির মূর্তিতে **হোরাস** নামে পূজা পেতেন। আর একজন বড়ো দেবতা ছিলেন **অসিরিস**। ইনি ছিলেন জীবিত ও মৃতের মালিক। এ ছাড়া ছিলেন **ইসিস, অ্যামন** প্রভৃতি নানা দেবতা। এঁরা সকলেই জাতীয় দেবতা ছিলেন।

ধর্ম-চর্চার ব্যাপারে এক রকম স্বাধীনতা ছিল। প্রত্যেক জেলার নিজস্ব দেবতা ছিল। সেখানকার লোকেরা ইচ্ছামত এক বা একাধিক দেবতার পূজা করতে পারত। এছাড়া নতুন কোন শহর পত্তন হলে সেখানে নতুন একজন দেবতার দরকার হতো। স্থানীয় লোকেরা ইচ্ছামত স্থানীয় দেবতা পছন্দ করে নিতে পারত। মর্যাদার দিক থেকে কোন্‌ দেবতা কার চেয়ে বড়ো ছিলেন বলা কঠিন। তবে যাঁর ভক্তের সংখ্যা এবং মন্দিরের সম্পত্তি যেমন তিনি তেমন মান-মর্যাদা পেতেন।

দেবতার সংখ্যা বেশী বলে মিশরে মন্দিরের সংখ্যাও ছিল অনেক। এই সমস্ত মন্দির পরিচালনা এবং দেবতাদের ভোগের খরচ যোগাতেন রাজা। মন্দিরগুলি ছিল 'দেবতাদের সংসার'-এর মত। মন্দিরের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। সেই সম্পত্তির আয় দেবতার সংসারে জমা হতো। রাজাও নিজেকে দেবতার সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে রাজ্য শাসন করতেন। মন্দিরের সেবাইত পুরোহিতদেরও সমাজে খুব সম্মান ছিল। তাঁরা রাজা বা ফ্যারাওদের মঙ্গল কামনা করে দেবতার কাছে পুজো দিতেন। দেবতার সংসার থেকে পুরোহিতদের সংসার চালাবার জন্য জিনিসপত্র দেওয়া হতো।

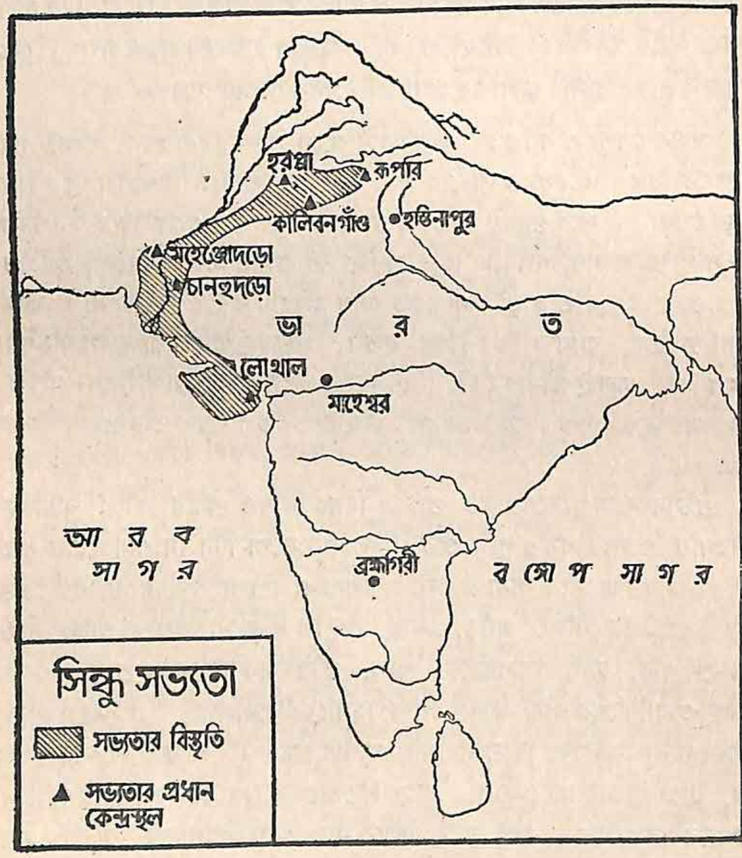
প্রধান পেশা ও বৃত্তি ঃ জলবায়ুর গুণে মিশরীয়েরা বেশ সুস্থ, সবল ও কর্মঠ ছিল। একেবারে গোড়ার দিকে পশুশিকার ছিল মিশরীয়দের সবচেয়ে বড়ো পেশা। পরে গ্রামের লোকেরা চাষবাস এবং মাছ-ধরার দিকে মন দিল। এর সঙ্গে রইল পশুপালন। তবে দেশের সব জমির মালিক ছিলেন ফ্যারাও। ফ্যারাওয়ের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ জমি ব্যবহার করতে পারত না। জমির জন্য চাষীদের বার্ষিক কর দিতে হত। শহরের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং ঢালাই তামার তৈরি জিনিসপত্র উৎপাদনের কাজ নিয়ে থাকত। নীলনদের বুকে পণ্য নিয়ে সওদাগরী জাহাজ চলাচল করত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্রাচীন সুমের দেশের মত প্রাচীন মিশর দেশেও ধীরে ধীরে নানারকম কারিগরি শিল্পের পসার জমে ওঠে। তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ ধাতু তৈরি করা, ব্রোঞ্জ দিয়ে নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি বানানো, ইট তৈরি, কাঠ চেরাই করে নৌকা, গাড়ি, চেয়ার প্রভৃতি বানানো, পশুর চামড়া দিয়ে সাজ-পোশাক, ঢাল, তলোয়ারের খাপ, তীর রাখবার তূণ প্রভৃতি তৈরি, কলাই ও বার্ণিশের কাজ অনেক পেশা হিসাবে নিয়েছিল। এ সমস্ত ছাড়াও ক্ষৌমবস্ত্র বা লিনেনের কিছু নমুনাও পাওয়া গেছে। এথেকে বুঝতে পারা যায়, চার হাজার বছর আগে মিহি সুতোর বুনোনির কাজে মিশরীয়দের কতখানি দখল ছিল। এই ভাবে মিশরে নানা রকম পেশাদার বা বৃত্তিজীবী শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়েছিল।

● সিন্ধু সভ্যতা

ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন দেশ। সেইজন্য এখানকার সভ্যতাও প্রাচীন। এই সভ্যতার ধারা প্রস্তর যুগ ও ধাতু যুগের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। ভারতবর্ষেও প্রাচীন প্রস্তর যুগের অমসৃণ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে।

অনুমান করা হয়, সে যুগের মানুষের বংশধরেরা এখনও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের কার্যকলাপের নিদর্শন ভারবর্ষের বিভিন্ন অংশে দেখতে পাওয়া গেছে। মাদ্রাজের বেলারি জেলায় এই যুগের পাথরের সরঞ্জাম তৈয়ারি একটি পুরনো কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে। নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র ছিল আগেকার তুলনায় অনেক মসৃণ,



তীক্ষ্ন এবং দেখতে সুন্দর। এ যুগের মানুষেরা প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষদের চেয়ে অনেক কিছু বেশী জানত এবং স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করত। এখনকার কোল, ভীল, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা—এরা নব্য প্রস্তর যুগের মানুষদের বংশধর বলে মনে করা হয়। এর পরে আসে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ। এই সময় থেকে পাথরের সংগে সংগে ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়। দক্ষিণ ভারতের

দ্রাবিড়জাতি খুব সম্ভব এই সময়কার মানুষদের বংশধর। যে সময়ের কথা বলা হলো, একে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয়ে থাকে।

আবিষ্কারসমূহ : যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছরেরও আগে ভারতবর্ষের সিন্ধু নদের উপত্যকায় এক প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠে। সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদড়ো এবং পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলার ইরাবতী নদীর তীরে হরপ্পাতে পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে খনন চালানো হয়। এ ছাড়া বালুচিস্তানের চানহুদারো, গুজরাটে আমেদাবাদের কাছে লোথাল প্রভৃতি জায়গায় খননের ফলে ভারতের অতি প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন দেখতে পাওয়া গেছে।

'মহেঞ্জোদড়ো' কথাটির অর্থ 'মৃতের স্তূপ'। মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কারের গৌরব বাঙালী পুরাতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পার মাটির তলা থেকে যে সমস্ত জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে তা পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষের সভ্যতা যে কত প্রাচীন তা ধারণা করতে পেরেছেন। এই আবিষ্কার ভারতবর্ষের সভ্যতাকে মিশর, আসিরীয় এবং ব্যাবিলনিয়ার প্রাচীন সভ্যতার প্রায় সমান পর্যায়ে তুলে ধরেছে। এই সভ্যতার নাম হলো সিন্ধুসভ্যতা।



রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সিন্ধুসভ্যতাকে কেউ কেউ ব্রোঞ্জ যুগের তৃতীয় সভ্যতা বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ব্রোঞ্জে তৈরি পুরনো সাজ-সরঞ্জাম ভারতবর্ষে পাওয়া গেলেও, তামা বাদ দিয়ে শুধু ব্রোঞ্জের ব্যবহার ভারতবর্ষে হয়নি বলে মনে হয়। এইজন্য ঠিক 'ব্রোঞ্জ যুগ' বলে কোন যুগ ভারতবর্ষের বেলায় নির্দেশ করা কঠিন। তাই সিন্ধুসভ্যতাকে ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা না বলে অনেকে তাম্র যুগের সভ্যতা বলে মনে করেন। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার মাটির নিচে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গেছে, তা থেকে সিন্ধুসভ্যতার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। অধিবাসীরা নাগরিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিল। তাদের সভ্যতার মান ছিল উন্নত ধরনের। তারা পরিকল্পনা করে নগর নির্মাণ করতে পারতো এবং নাগরিক জীবনেও তাদের সুসভ্য পরিবেশ ছিল। এছাড়া তামা ও ব্রোঞ্জে তৈরি

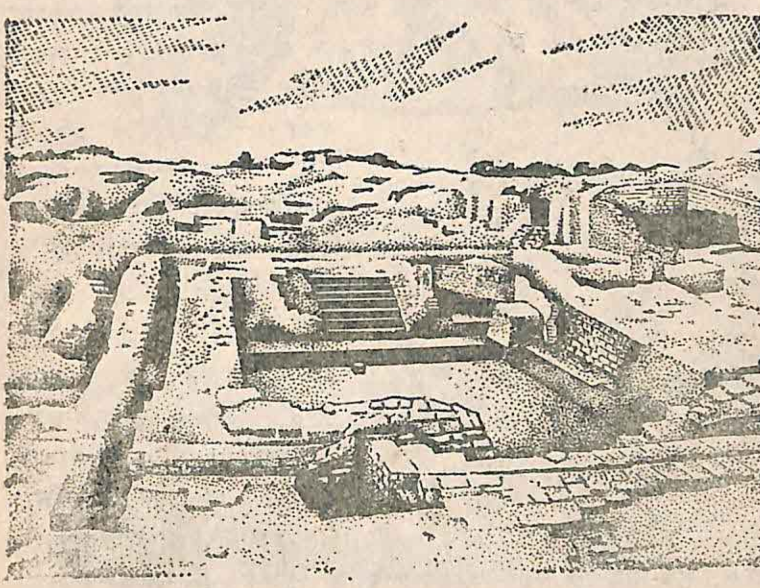
অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হতো। মুদ্রার ব্যবহার, মাটির পাত্র, চাকায় টানা যানবাহন, পোড়া ইটের ঘরবাড়ি এবং সোনা, রুপো, গজদন্ত বা মূল্যবান পাথর ও শঙ্খ দিয়ে তৈরি গহনা ব্যবহারেরও চলন ছিল।

নগর পরিকল্পনা ঃ মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পার সবচেয়ে বড়ো কীর্তি হচ্ছে সেখানকার নগর পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। নগরীর ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে ভাঙাচোরা যে সমস্ত চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, তার পরিকল্পনা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। শহরের বড়ো বড়ো রাস্তা বা রাজপথগুলি ছিল সোজা ও চওড়া। এগুলি নিয়মিত সাফাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। জলনিকাশী নর্দমা দেখে মনে হয়, এই সমস্ত জায়গায় পৌর-প্রশাসনের তদারকি সুবন্দোবস্ত ছিল। শুধু তাই নয়, রাস্তাঘাট বা ঘরবাড়ি তৈরির সময় লোকে যাতে নগর পরিকল্পনার নিয়মকানুন মেনে চলে সেজন্য পৌর কর্তৃপক্ষ কড়া নজর রাখতেন।

মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভাঙাচোরা নগরীর যে অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে, তা দেখলে, আধুনিক শহরের কথা মনে পড়ে। নগরীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অনেক রাজপথ ছিল। সেই রাজপথের দুধারে ছিল বড়ো বড়ো সারিবন্ধ কোঠা বাড়ি। সেগুলি পোড়ানো ইটে তৈরি। সিঁড়ির চেহারা দেখে বুঝতে পারা যায় যে, কোঠা বাড়িগুলি দোতলা, তেতলা কিংবা আরও বেশী তল-বিশিষ্ট ছিল। পাথর বসিয়ে সিঁড়ি, ঘরের উঠান এবং মেঝে সুন্দরভাবে সাজানো থাকত। ঘরের দেওয়ালগুলি ছিল বেশ ঝকঝকে এবং মসৃণ। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে শোবার ঘর, রান্নাঘর, শান-বাঁধানো স্নানঘর, পাতকুয়া, প্রভৃতি ছিল। প্রতিটি বাড়ি থেকে জল নিকাশের সুব্যবস্থা ছিল। মাটির নিচে দিয়ে ছিল নর্দমা। মহেঞ্জোদড়োতে বড়ো থামওয়ালা একটি ঘর আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেকের অনুমান, ওটি হয় রাজপ্রাসাদের অংশ, না হয় তো সভাঘর কিংবা শস্যাগার ছিল।

শুধু রাজপথই নয়, নগরীর মধ্যে সরু গলিপথও ছিল সংখ্যায় অনেক। এক গলি থেকে অন্য গলিতে বা রাজপথে সহজেই যাতায়াত করা যেত। জল নিকাশের জন্য কোঠা বাড়ির ছাদ থেকে মাটি পর্যন্ত বড়ো বড়ো নল এবং নিচে ময়লা জলের কুণ্ড থাকত। সদর রাস্তায় মাঝে মাঝে জঞ্জাল ফেলবার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ছিল। সেই সব জায়গা থেকে নিয়মিতভাবে জঞ্জাল সাফাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। রাজপথের দুপাশে ছিল ইটবাঁধানো ময়লা ও জল-নিকাশী নর্দমা। সেই সমস্ত নর্দমার নালাপথ দিয়ে শহরের ময়লা জল বাইরে বেরিয়ে যেত।

মহেঞ্জোদড়োতে একটি বিরাট স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই স্নানাগারটি মধ্যে একটি বড়ো আঙিনা ছিল। তার মাঝখানে স্নান করা এবং সাঁতার কাটবার জন্য গভীর একটা পাকা চৌবাচ্চা তৈরি করা হয়েছিল এখানে একসঙ্গে অনেক লোক স্নান করতে পারত। আঙিনার চারধারে ছিল ছোট ছোট ঘর। একটি ঘরের ভিতরকার কুয়া থেকে মোটা নলের মতো নালা-পথে জলাধারে জল ভরা হতো। আবার প্রয়োজন মতো নর্দমা দিয়ে জলাধার থেকে জল বের করে ফেলতে পারা যেত। এখানে জল গরম করবারও ব্যবস্থা



মহেঞ্জোদড়োর বিরাট স্নানাগার

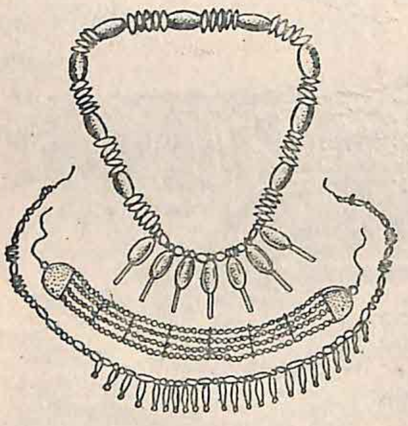
ছিল। সেকালের মানুষ ইঞ্জিনিয়ারিং বা বাস্তুবিদ্যায় কত উন্নতি করেছিল, তা এই সমস্ত ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায়।

খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ঃ নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সমস্ত জিনিসপত্রের চিহ্ন পাওয়া গেছে, তা থেকে সেই যুগের নাগরিকদের জীবনযাত্রার ধরন অনুমান করা যায়। রান্নাঘরে খাদ্যসামগ্রী রাখবার পাত্রে যব, গম, খেজুর, মাছের কাঁটা এবং পশুর হাড় পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমান করা হয়, গম ছিল তখনকার লোকের প্রধান খাদ্যশস্য। তা ছাড়া মাংস, ডিম, দুধও তাদের খাদ্যতালিকায় ছিল। অনেকের ধারণা,

মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পায় ধানের চাষও হতো। তবে চাল সেখানকার প্রধান খাদ্য-শস্য ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

বিভিন্ন জীবজন্তুর কঙ্কাল এবং সীলমোহরে গোরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, হাতী প্রভৃতি জন্তুর ছবি দেখা গেছে। কিন্তু গাধা বা ঘোড়া সম্পর্কে কোন কিছু পাওয়া যায় নি। মহেঞ্জোদড়োতে এক টুকরো কার্পাস তুলোয় তৈরি কাপড় পাওয়া গেছে। মাছ ধরবার বঁড়শি, সূচ এবং সুতোর ব্যবহারও যে প্রচলিত ছিল তারও প্রমাণ মিলেছে।

মূর্তি এবং চিত্রগুলি দেখে বুঝতে পারা যায় যে, এখানকার লোকেরা কাপড় পরত, গায়ে চাদর দিত। মহিলারা নানা ছাঁদে চুল বাঁধত এবং বিভিন্ন প্রকার প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করত। পুরুষ-মহিলা সকলেই হার, বালা প্রভৃতি গহনা পরত। মহিলাদের মধ্যে নাকে নথ, কানে দুল, পায়ে মল পরবার রীতি প্রচলিত ছিল। সোনা, রুপো, তামা, হাতীর দাঁতের গহনা ছাড়াও নানা রকমের দামী পাথরের গহনা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। গৃহস্থেরা তামা, রুপো, ব্রোঞ্জ, চীনামাটি এবং মাটির নানা রকম বাসনপত্র ব্যবহার করত। মাটির পাত্রগুলিকে নানারঙে চিত্রিত করবার রীতি ছিল। এগুলিতে তখনকার দিনের কারিগরদের শিল্প-নৈপুন্যের পরিচয় পাওয়া যায়।


সিন্ধু সভ্যতা যুগের অলংকার

কারিগরি শিল্প ঃ মহেঞ্জোদড়োতে কারিগরি শিল্পের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ায় যে ধরনের কারিগরি শিল্পের উদ্ভব ঘটে, তার সঙ্গে সেসময়কার ভারতবর্ষীয় কারিগরি শিল্পের অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, কুমোরেরা মাটির পাত্র তৈরি করতে একই রকম চাক ব্যবহার করত, কামারেরা একইভাবে তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ ধাতু তৈরি করত। কিন্তু উভয় দেশের তৈরি শিল্পসামগ্রী ভিন্ন রকমের ছিল। কুড়ুল, করাত, ছোরা কিংবা বর্শার ফলা—ভারতবর্ষে তৈরি এই সমস্ত কারিগরি শিল্পসামগ্রী ছিল সুমেরীয় বা মিশরীয় শিল্পসামগ্রী থেকে আলাদা ধরনের। ভারতীয় তাঁতীরা তুলোর পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করত, তারা পশম বা শণ

ব্যবহার করত না। গহনা এবং পাত্রাদিতে নানা রঙের প্রলেপ লাগিয়ে জেল্লা ধরানোর কলাকৌশলও তাদের জানা ছিল।

এ ছাড়া কারিগরি শিল্পসামগ্রীর আরও চিহ্ন পাওয়া গেছে। হাড়ের টুকরো দিয়ে সুতো কাটবার তকলি বা টাকু তৈরি করা হতো, সুচ এবং চিরুনি হতো হাড়ের টুকরো বা হাতীর দাঁত দিয়ে। কুড়ুল, বর্শা, ক্ষুর,



সিন্ধু সভ্যতা যুগের মাটির পাত্র

ছুরি, বঁড়শি প্রভৃতি তৈরি করতে তারা তামা এবং ব্রোঞ্জ ব্যবহার করত। সে যুগের মানুষ লোহার ব্যবহার জানত, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এছাড়া নানা প্রকারের খেলনা, মাটির তৈরি পাখি, ঝুনঝুনি, পুতুল, চাকা-লাগানো ছোট ছোট ঠেলাগাড়ি প্রভৃতির ব্যবহারও চলিত ছিল। নগরীর



মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলমোহর

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দেখা গেছে পানীয়-বিক্রেতাদের দোকানঘরের মেঝে ভাঙা মাটির ভাঁড়ের টুকরোতে ভরতি। সম্ভবতঃ এক শ্রেণীর লোক এই ধরনের মাটির ভাঁড় তৈরির কাজ করত। এই সমস্ত তথ্য থেকে অনুমান করা চলে যে, সে সময় বহু লোক শ্রমশিল্পে নিযুক্ত থেকে জীবিকা অর্জন করত।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যেও সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীরা বেশ অভিজ্ঞ ছিল। এশিয়া ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগে যে তাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ওজনের বাটখারার মতো অনেকগুলি পাথরখন্ড পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলে কোন

খনির চিহ্ন নেই। নানা রকম ধাতুর তৈরি জিনিসের ব্যবহার দেখে মনে হয়, দূর-দূরান্ত থেকে সেই সমস্ত আমদানি করা হতো। রাজপুতানা ও বেলুচিস্তান থেকে তামা এবং দক্ষিণ ভারত থেকে শঙ্খ আনা হতো। ভারতের বাইরে থেকে আমদানি হতো টিন, সোনা ও অন্যান্য দামী ধাতু। এই অঞ্চলে অনেক সীলমোহর পাওয়া গেছে। মনে হয়, এগুলিকে বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করা হতো। এর উপরের লিপিগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। দুটি সীলমোহরে নৌকার ছবি দেখে মনে হয় এই অঞ্চলের লোকেরা নৌচালনা জানত।

এখানে মেসোপটমিয়া অঞ্চলে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর বেশ চাহিদা ছিল বলে মনে হয়। কারণ, সেখানকার তৈরি প্রসাধন সামগ্রীর চিহ্ন, চোঙাকৃতি সীলমোহর মহেঞ্জোদড়োয় পাওয়া গেছে। আবার এখানকার কয়েকটি সীলমোহর মেসোপটমিয়া অঞ্চলে দেখা গেছে। ষাঁড়ের পায়ের অনুকরণে পায়াওয়ালা টুল, দীপাধার প্রভৃতি কয়েক রকম মিশরীয় তৈজসপত্র সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে মনেহয়, মেসোপটমিয়া এবং মিশরের সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। মহেঞ্জোদড়োর বিশেষত্ব দেখে মনে হয়, নগরীটি বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবেই গড়ে উঠেছিল।



পশুপতি মূর্তি

ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে ঠিক কোন্ ধরনের মুদ্রা বা মূল্যমান চলিত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে নাগরিকদের অনেকের বাড়ির পাশে বড়ো বড়ো মজুত ভাণ্ডার বা গুদাম ঘরের চিহ্ন দেখে মনে হয়, তারা ছিল সওদাগর। মহেঞ্জোদড়োতে সওদাগর সম্প্রদায় বেশ অবস্থাপন্ন ছিল।

ধর্মানুষ্ঠান ঃ সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া মূর্তিগুলি দেখে সে যুগের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়। এই অঞ্চলে কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত না হলেও মূর্তিগুলি দেখে

মনে হয়, তখন সমাজে মাতৃপূজার সঙ্গে পুরুষ-দেবতার পূজাও প্রচলিত ছিল। এখানে যোগাসনে বসা একটি পশুপতি শিবের মূর্তি এবং শিবলিঙ্গের মতো কতকগুলি পাথরখণ্ডও পাওয়া গেছে। জীবজন্তু, পাথর এবং গাছ পূজারও চলন ছিল। এই সবের মধ্যে ভূত, প্রেত কিংবা সৎ আত্মা বাস করত বলে লোকে বিশ্বাস করত। এই বিশ্বাস থেকেই নাগপূজা, যক্ষপূজার চলন হয়। মৃত দেহকে দাহ করা এবং কবর দেওয়া—উভয় প্রকার প্রথাই সেকালে চলিত ছিল।

সমাজে শ্রেণী-বিন্যাস ঃ মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয়, সমাজে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ না থাকলেও সকল মানুষই সমান ছিল না। একদিকে বেশ খোলা-মেলা ইটে-গাঁথা পাকা দোতলা বাড়ি, সঙ্গে স্নানঘর, দেউড়িতে দারোয়ানের ঘর, আর অন্য দিকে সারি সারি এক ধরনের কাঁচা গাঁথুনির তৈরি বস্তিবাড়ি,—এই বৈষম্য স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে শ্রেণী-বিভাগের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে সমাজে যে নানা শ্রেণীর মানুষ ছিল তা বলা যায় না। ধনী, বণিক অথবা ব্যবসায়ী এবং মেহনতী শ্রমিক অথবা কারিগর—এই দুই শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত ছিল। কারিগরি শ্রেণীর মধ্যে ছিল কুমোর, কামার, সেকরা, তাঁতী, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদি।

সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের মানুষেরা ছিল সুশিক্ষিত। তবে তারা যে লিপি ব্যবহার করত, এখনও পর্যন্ত তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বাস্তুবিদ্যা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতি তাদের মার্জিত শিক্ষা ও সুরুচির পরিচয় দেয়। মহেঞ্জোদড়োয় একটি ব্রোঞ্জের তৈরি নর্তকী মূর্তি পাওয়া গেছে। তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেকালে নারীদের মধ্যে নাচগানের চর্চা ছিল।

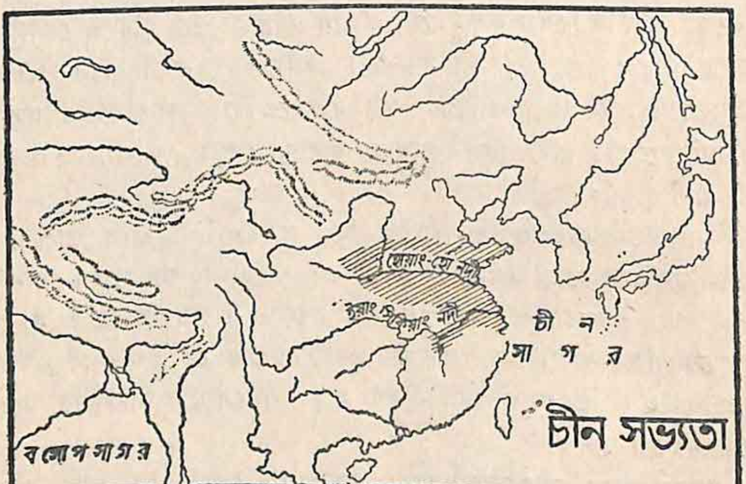
মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটির পর একটি করে সাতটি স্তর দেখতে পাওয়া গেছে। এই ব্যাপার থেকে বোঝা যায়, নগরীটি বারবার ধ্বংস হয়েছিল এবং বারবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছিল। ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে আবার গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল তাও নয়। কারণ, প্রত্যেক স্তরের পরিকল্পনা ছিল আগেকার স্তরের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন রকমের।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুহাজার বছর আগে এক সময় মহেঞ্জোদড়োর মহিমা লুপ্ত হয়ে যায়। সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে ব্রোঞ্জ যুগের এই মহান সভ্যতা কেমন করে ধ্বংস হলো, তাও এক কথায় বলা কঠিন। কারও কারও ধারণা, যে-কোন কারণেই হোক, এই সভ্যতার ভিতরে ভাঙনের সূচনা হয়,

ফলে বাইরের শত্রুর আক্রমণে তা' ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, সিন্ধু নদের প্রবল বন্যার জলে এই ভূখন্ড ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তবে একথা ঠিক যে প্রাগৈতিহাসিক কালে ভারতবর্ষের এই ভূখন্ডে যে সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছিল তা পরবর্তীকালের ভারতীয় সভ্যতার উপর নানা দিক থেকে প্রভাব বিস্তার করেছে।

● মহাচীন

হুয়াং-হো এবং ইয়াং-সি-কিয়াং উপত্যকা : খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের কথা। তখন ব্রোঞ্জে যুগীয় সভ্যতার চরম উন্নতির পর্ব চলছে। সিন্ধু উপত্যকার মতো হুয়াং-হো এবং ইয়াং-সি-কিয়াং,—এই দুটি নদীর পলিমাটিতে-গড়া উপত্যকা অঞ্চলে আর একটি সভ্যতার উদ্ভব



চীন সভ্যতা

ঘটে। এটি হচ্ছে চীনের সভ্যতা বা চৈনিক সভ্যতা। কারও কারও ধারণা, চৈনিক সভ্যতার সূচনা হয় চীনের উত্তর-পশ্চিম দিকের তারিম নদী-উপত্যকায়। এই অঞ্চল শুষ্ক এবং লোকবসতিও খুব কম। কিন্তু এক সময় এখানকার মাটি ছিল উর্বর। এখান থেকে চৈনিক সভ্যতা কুয়েন লুঙ পর্বত পার হয়ে অধিত্যকা ধরে হুয়াং-হো বা পীত নদীর তীর ছড়িয়ে পড়ে।

হুয়াং-হো নদীর জল হলদে রঙের বলে এর নাম হয়েছে 'পীত নদী'। এই নদীর আর এক নাম 'দুঃখের নদী', কারণ এই নদীর বন্যা সময় সময় ভয়ংকর হয়ে দেখা দিত। তখন নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষের অনেক

ক্ষয়-ক্ষতি হতো। তা হ'লেও হুয়াং-হো এবং ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর তীরের সুজলা জমির উর্বরতা এই অঞ্চলকে অফুরন্ত শস্যসম্পদে ভরে দিয়েছিল।

খননের ফলে যেমন মেসোপটামিয়া, মিশর এবং সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার অনেক রকম উপকরণ পাওয়া গেছে, চীন দেশে তেমন কোন বড়ো রকমের খনন সম্ভব হয়নি। হোনান এবং মাঞ্চুরিয়ায় খননের ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের যেসব উপকরণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলিই প্রাচীন চীনকে জানবার সূত্র জুগিয়েছে।

পুরাকালের চীন ঃ চীন এক বিশাল দেশ। বাইরের অঞ্চল এবং তিব্বত নিয়ে এর আয়তন প্রায় ইউরোপ মহাদেশের সমান। খাস চীনের আয়তন পনের লক্ষ বর্গ মাইল। এর উত্তরে মোঙ্গলিয়া ; পশ্চিমে তুর্কীস্থান ও তিব্বত ; দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও চীনসাগর ; পূর্বে মাঞ্চুরিয়া, পীত সাগর এবং চীন সাগর। আদ্যিকালের চীনেরা খাস চীনকে বলত সি-পা-সেং অর্থাৎ আঠারো প্রদেশ।

চীন নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা ধারণা প্রচলিত আছে। চৌ বংশের রাজত্বকালে কেবলমাত্র হুয়াং-হো এবং ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল সভ্য ছিল। তখন এর নাম ছিল চুং হুয়ে অর্থাৎ ভূমধ্য। এই ভূমধ্য দেশের একটি অঞ্চলের নাম ছিল চীন (Tsin)। চীনের শাসনকর্তা (শি-হোয়াং-তি) যখন চৌ রাজবংশের উচ্ছেদ করে সারা ভূমধ্যদেশ নিজের কর্তৃত্বে আনেন, তখন থেকেই ভূমধ্যদেশের নূতন নামকরণ হয় চীন।

পৃথিবীর প্রাচীন জাতির মধ্যে চীনাদের ইতিহাসের প্রতি সমাদর ছিল। সু-কিং (ইতিহাস গ্রন্থ) নামে একখানি পুঁথিতে কনফুসিয়াসের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন চীনের বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে জানতে পারা গেছে। চীনের ইতিহাসের অতি প্রাচীন কালকে বলা হয় পঞ্চ নৃপতির যুগ। এই যুগের প্রথম রাজা শাসক ছিলেন ফু সি। তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু অলৌকিক কাহিনী চলিত থাকলেও সুশৃংখল শাসনব্যবস্থা, চিত্রলিপির প্রচলন, সমাজে বিবাহ-প্রথা চালু করা প্রভৃতি কাজের জন্য তাঁর রাজত্বকাল স্মরণীয় হয়ে আছে। পরবর্তী রাজা সেন লুঙের সময় কৃষিকাজের জন্য কাঠের লাঙলের প্রচলন, চিকিৎসাবিদ্যার সূচনা, দ্রব্য বিনিময় সূত্রে ব্যবসার প্রচলন হয়েছিল। তৃতীয় রাজা হুয়াং তি ছিলেন অবশ্য সবচেয়ে বিখ্যাত। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন জাতির জনক এবং তাঁর সময় থেকেই ইতিহাসের আদিপর্ব গণনা করা যেতে পারে। চতুর্থ রাজা ইয়া ছিলেন আদর্শ প্রজাপালক। যে-কোন প্রজা তার অভাব-অভিযোগ অবাধে তাঁর কাছে জানাতে

পারত এবং তিনি তার প্রতিকার করবার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকতেন। পঞ্চম রাজা সুন শাসন ব্যবস্থায় নানা রকমের পরিবর্তন এনেছিলেন বলে তাঁকে একজন সমাজ-সংস্কারক বলা হয়।

পঞ্চ নৃপতির যুগের অবসানের পর সিয়া বংশের শাসনকালের সূচনা। এই বংশের প্রথম রাজা ইউ সুন নির্বাচিত হয়ে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। এঁর রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। কিন্তু এই বংশের শেষ রাজা চিয়ে ছিলেন অপদার্থ এবং বিলাস-ব্যসনে মত্ত। চেং ট্যাং নামে একজন বীর তাঁকে পরাস্ত করে স্যাং বা ঈন্ বংশ-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ঈনের স্তূপ নামে পরিচিত। এই স্তূপ খননের ফলে যে সব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে তা থেকে প্রাচীন চীনের জীবনযাত্রার অনেক কিছু জানা যায়।



চীনের আদি পুরুষ পান্-কু

পৌরাণিক অতিকথা: প্রাচীন চীনে নানা প্রকারের পৌরাণিক অতিকথা বা 'মিথ'-এর সৃষ্টি হয়েছিল। বন্যা নিয়েও চীনে একটি কিংবদন্তী আছে। তাতে মানুষের শ্রমেরই বিজয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিপুল জলভার নিয়ে বন্যা একবার চীনের সব অঞ্চল ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বাকি ছিল শুধু পাহাড় আর পর্বতের যত চূড়া। বাঁচবার জন্য মানুষ দলে দলে গিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিল। প্রায় দশ বছর সে জল নামল না। বাইবেলে যে 'মহাপ্লাবন'-এর বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে এই বন্যার তুলনা চলে। ওয়াই-ই (yi) নামে একজন লোক দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে নদীর ধারে বাঁধ বাঁধল, খাল কাটাল আর খুঁড়ে খুঁড়ে নদীগুলো অনেক গভীর করল।

তখন ধীরে ধীরে নদীর জলস্রোত দুই তীরের উঁচু বাঁধের মধ্যে আটকে রইল। বন্যার জল গেল নেমে। লোকজনও পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নেমে এল। আবার সে দেশ হয়ে উঠল শস্য শ্যামল।)

এ সবই কিন্তু হল মানুষের শ্রমের ফলে। একদিন তারা হুয়াং-হো নদীকে যেভাবে শাসন করেছিল, তাই কিংবদন্তীতে রূপায়িত হয়েছে।

আর একটি উপকথায় আছে পান-কু নামে একজন এই জগৎ সৃষ্টি করেন। মহাশূন্যের বুকে পাথর ও শিলাখণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিরাটকায় পুরুষ পান-কু হাতুড়ি ও বাটালি দিয়ে কেটে কেটে নিপুণ ভাস্করের মত গড়ে তুললেন সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলী। তাঁর পাশে রয়েছে সহচর ড্রাগন, ফিনিক্স, কচ্ছপ প্রভৃতি। এরা জীবজগতের আদিপুরুষ আর পান-কু হলেন চীনের মানব জাতির আদিপুরুষ। আঠারো হাজার বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করবার জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মবিসর্জন দেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পাহাড়-পর্বত, শিরা-ধমনী থেকে নদ-নদী, মাংসপেশী থেকে গাছপালার সৃষ্টি হয়। তাঁর গায়ের ঘাম বৃষ্টিধারা হয়ে ঝরে পড়ে এবং তাঁর দেহে যে সমস্ত কীট ছিল, তারা মানুষে রূপান্তরিত হয়।

নদীমাতৃক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রাচীন মানবসমাজ কতকগুলি আমূল পরিবর্তন ঘটে, যাকে বলা যায় এক ধরনের বিপ্লব। এই বিপ্লবের পূর্বে হাজার বছর যাবৎ যে সমস্ত আবিষ্কার ঘটে, সেগুলি একত্রিত হয়ে বিশাল পৃথিবীর বুকে তিনটি ভূখণ্ডে সভ্যতার জন্ম হয়! সেই ভূখণ্ড তিনটি হচ্ছে মেসোপটেমিয়া, মিশর এবং সিন্ধু উপত্যকা। তিনটি সভ্যতারই জন্ম হয়েছিল নদী-উপত্যকায়। সেইজন্য ভৌগোলিক পরিবেশের দিক থেকে তিন দেশের অনেকটা মিল ছিল। চৈনিক সভ্যতারও উদ্ভব ঘটে নদী-উপত্যকায়। কিন্তু এই তিনটি নদীমাতৃক সভ্যতার মধ্যে যতটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যগত মিল দেখা যায় চীনের সঙ্গে ততটা নেই। তার কারণ চীনের সভ্যতা অনুকূল জলবায়ুর পরিবেশ ইয়াং-সি-কিয়াং উপত্যকায় গড়ে ওঠেনি। চীনের সভ্যতার আদি লীলাভূমি ছিল প্রতিকূল পরিবেশের হুয়াং-হো উপত্যকা।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী, নীল নদ এবং সিন্ধু নদের পলিমাটিতে গড়ে ওঠা উপত্যকায় এক নূতন পরিবেশ গড়ে ওঠে! চীনেও তেমনি হুয়াং-হো

উপত্যকার পলিমাটিতে আর একটি নূতন সভ্যতার পরিবেশ উঠেছিল। এসব অঞ্চলের মানুষ প্রকৃতিকে বশ করে জীবন-যাপনের জন্য সচেষ্ট হয়। জলাভূমি এবং মরুভূমিকে চাষবাসের উপযোগী করে উৎপাদন শুরু করে। ফলে, এই সব জমিতে প্রচুর পরিমাণে শস্য এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী উৎপন্ন হতে থাকে। কোন জায়গায় অজন্মা হলে খাদ্যাভাবে প্রাণহানির ভয় দূর হয়ে যায়। কারণ, জল ও স্থলপথে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় শহরের শস্যভাণ্ডার থেকে সারা উপত্যকা এলাকায় খাদ্য সরবরাহ করা সহজ হয়ে ওঠে।

জীবনযাত্রার মান ঃ নদীমাতৃক সভ্যতার উন্মেষের পর মানুষের জীবন-যাত্রার মানও আগের চেয়ে উন্নত হয়ে ওঠে। শাসক শ্রেণী বা নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ নানা ধরনের খাদ্যের সুযোগ লাভ করে। পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থাও বর্বর যুগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়। যেমন, পারস্য উপসাগর থেকে মেসোপটমিয়ার লাগাস শহরে কিংবা আরব সাগর থেকে মহেঞ্জোদড়োতে প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ আমদানি হওয়ায় সাধারণ মানুষ কম দামে মাছ কেনার সুযোগ পায়। প্রস্তর যুগের মানুষদের সামনে এ সুযোগ ছিল না। হরপ্পাতে শ্রমিকদের বাসস্থানের যে ভাঙাচোরা চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে, তা নব্য প্রস্তর যুগের কুঁড়েঘরের চেয়ে অনেক উন্নত ও আরামের।

নদীমাতৃক সভ্যতার যুগে যে নূতন অর্থনীতি গড়ে ওঠে, তার মূলে ছিল তাম্রযুগের আবিষ্কার সমূহের সদ্ব্যবহার। তাম্রযুগেই বলদে-টানা লাঙল, ধাতুবিদ্যা, বিশেষতঃ তামা আগুনে গলিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ পাথরকে উন্নত ধরনের পাথরে পরিণত করবার কৌশল, মাটির পাত্র তৈরির জন্য কুমোরের চাক, বলদে-টানা গাড়ি প্রভৃতির প্রচলন হয়। এই সমস্ত জিনিসকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে সে যুগের মানুষ যেমন একদিকে হাড়-ভাঙা খাটুনি থেকে মুক্তি পেল, তেমনি তাদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ নিয়ে এল।

অন্যদিকে প্রয়োজনীয় ধাতুদ্রব্যের স্বল্পতার দরুন এই ধরনের সুবিধা ভোগের সুযোগ অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। তামা বা ব্রোঞ্জ ছিল পাথরের তুলনায় অনেক দামী। সেইজন্য পাথরের পরিবর্তে তামা বা ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতির চলন খুব সহজ হল না। কারণ তামা কিংবা টিন দূর দেশ থেকে আনতে খরচও অনেক লাগে। যারা শিল্পকর্মে নিযুক্ত থাকত, তারা খাদ্যসামগ্রী নিজেরা উৎপন্ন করতে পারত না। কাজেই উদ্বৃত্ত খাদ্য-ভাণ্ডার থেকে তাদের খাদ্য জোগানো হত। চাষীসম্প্রদায়ের উৎপন্ন খাদ্যশস্য

থেকেই এই খাদ্যভাণ্ডার গড়ে ওঠত। কিন্তু ঐ খাদ্যভাণ্ডার থাকত মুষ্টিমেয় রাজা, মন্দির কর্তৃপক্ষ অথবা ধনী মানুষের জিম্মায়। তাই চাষীরা উদ্বৃত্ত সশ্যের বিনিময়ে নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহারের সুযোগ নিতে পারত না। তাই দেখা যায়, মিশরের কৃষক এবং শিকারীশ্রেণীকে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ পর্যন্ত নব্য প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

লিপি ও বিজ্ঞান বিদ্যার আবিষ্কার ঃ নদীমাতৃক সভ্যতার আর একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো লিপি, বিজ্ঞান বিদ্যা এবং অংকশাস্ত্রের আবিষ্কার। মেসোপটামিয়া, মিশর এবং ভারতবর্ষে নূতন অর্থনীতির প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের লিখন পদ্ধতির প্রবর্তন, জিনিসপত্রের হিসাব রাখবার জন্য সংখ্যা-চিহ্ন দিয়ে এক ধরনের অঙ্ক, মাপ ও ওজন ঠিক করবার উপায় বের করা হয়। এর ফলে এ যুগের মানুষ নিজেদের আর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

কৃষকশ্রেণী ঃ এ যুগের মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। সমাজের সব চেয়ে বড়ো অংশ ছিল কৃষক সম্প্রদায়। তাদের অবস্থা সর্বত্র সমান ছিল না, কোথাও কোথাও তারা কর দিয়ে স্বাধীনভাবে চাষবাস করতে পেরেছে, কোথাও বা দেবতা, রাজা অথবা ধনী সম্প্রদায়ের কাছে দায়বন্ধ চাষী হয়ে কাজ করতে হয়েছে, আবার কখনও বা কোন জমির মালিককে খাজনা দিয়ে জমি চাষ করেছে। এই কর বা খাজনা তারা শোধ করত উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে।

কারিগর ও শিল্পী ঃ কৃষক সম্প্রদায়ের পরেই উল্লেখযোগ্য হলো কারিগর শ্রেণীর মানুষ। কামার, কুমোর, ছুতোর, সেকরা, খনিকার, সীলমোহর প্রস্তুতকারক প্রভৃতি কারিগরেরা এই যুগের অর্থনীতি গড়ে তুলতে অনেকাংশে সাহায্য করেছিল। এই যুগে শিল্পীরও অভাব ছিল না। চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য চর্চার প্রসার নদীমাতৃক সভ্যতার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে শিল্পের জন্য শিল্প-চর্চা এই সময় সম্ভব হয় নি। কোন-না-কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন সামনে রেখেই শিল্পীরা শিল্পচর্চা করত।

দেবতা, মন্দির এবং পুরোহিততন্ত্র নানাভাবে নদীমাতৃক সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সিন্ধু উপত্যকায় অবশ্য কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নি। সেইজন্য এখানে পুরোহিততন্ত্রও গড়ে উঠতে পারে নি। তবে মেসোপটামিয়ায় এবং মিশরে দেবতা এবং পুরোহিতদের প্রভাব ছিল খুব বেশী। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা সবই ছিল পুরোহিতদের হাতে। রাজসভার প্রভাবও কম ছিল না। এদের ঘিরেই মেসোপটামিয়া এবং মিশরে বিভিন্ন পেশার মানুষ নিয়ে অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারেও নদীমাতৃক সভ্যতার দেশগুলি পিছিয়ে ছিল না। এই সমস্ত দেশে কাঁচামালের অভাব ছিল। সেইজন্য শহরের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাইরে থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে হতো। আবার শহরের কারখানায় তৈরি জিনিস বাইরে চালান যেত। বেলুচিস্তানের মাটির তলা থেকে সিন্ধু উপত্যকায় তৈরি ধাতুদ্রব্য এবং মাটির পাত্রাদি পাওয়া গেছে। আবার প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ায় তৈরি সীলমোহর এশিয়া মাইনর এবং গ্রীসে দেখা গেছে। মিশরে উৎপন্ন দ্রব্য যে সিরিয়ার উপকূল ও ক্রীট দ্বীপ পর্যন্ত চালান যেত, তারও প্রমাণ মিলেছে। নদীমাতৃক সভ্যতার ঘরোয়া ব্যবসা এবং বহির্বাণিজ্য প্রসার লাভ করেছিল। সেই সুদূর অতীত কালের মানুষেরা যে সমস্ত উদ্যোগ শুরু করেছিল, একালের মানুষ সেই সমস্ত উদ্যোগেরই উত্তরাধিকার বয়ে চলেছে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১. মানব সভ্যতার বিকাশ সর্বপ্রথম মেসোপটেমিয়ায় হয়েছিল কেন?

২. মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা বন্যা নিরোধের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করত সংক্ষেপে তার বিবরণ দাও।

৩. মানব সভ্যতার বিকাশে সুমেরীয়দের অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৪. 'জিগগুরাট' কী? এখানে কারা কী করতো? সাধারণ মন্দিরের সঙ্গে এর পার্থক্য বুঝিয়ে বলো।

৫. মেসোপটেমিয়ার পরিবহন-ব্যবস্থা ও বাণিজ্য সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে বিবৃত করো।

৬. লিপির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে সুমেরীয় লিপি সম্পর্কে তোমার বক্তব্য গুছিয়ে বলো।

৭. মিশরের অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৮. মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয় কেন?

৯. মিশরীয়দের জীবনে ফ্যারাও ও পুরোহিত-সম্প্রদায়ের প্রভাব সম্বন্ধে যা' জান সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

১০. মিশরীয় লিপির পরিচয় দিয়ে সমাজে লিপিলেখকদের অবস্থা কেমন ছিল বুঝিয়ে বলো।

১১. পিরামিড কাকে বলে? মিশরের 'গ্রেট পিরামিড' কোন্ রাজার আমলে তৈরী হয়েছিল?

১২. মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রধান পেশা সম্পর্কে যা জানো বলো।
১৩. মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কার করেছিলেন কে? সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যা জান সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
১৪. মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার নগর-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে বিবৃত করো।
১৫. মহেঞ্জোদড়োর কারিগরি শিল্প সম্বন্ধে যা জান বলো।
১৬. সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কী জান সংক্ষেপে বিবৃত করো।
১৭. মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সমাজে শ্রেণী-বিন্যাস সম্বন্ধে যা জান বলো।
১৮. মহেঞ্জোদড়োতে কারিগরি শিল্পের কতদূর উন্নতি হয়েছিল বলো।
১৯. হুয়াং-হো এবং ইয়াং-সি-কিয়াং উপত্যকার বর্ণনা দাও।
২০. সু-কিং বা ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত প্রাচীন চীনের শাসন-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২১. নদীমাতৃক সভ্যতার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো।
২২. নদীমাতৃক সভ্যতার অধীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা কেমন ছিল?

● মৌখিক প্রশ্ন

১. মানব-সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয় কোথায় ঘটেছিল?
২. 'মেসোপটামিয়া' কথাটির অর্থ কী?
৩. মেসোপটামিয়ার অধিবাসীদের প্রধান পেশার নাম করো।
৪. মিশর দেশটি কোন্ মহাদেশে অবস্থিত?
৫. মিশরের প্রথম রাজবংশের প্রথম রাজার নাম কী?
৬. মিশরের 'গ্রেট পিরামিড' কোন্ রাজার আমলে তৈরী হয়?
৭. শুল্ক-আদায়কারীরা কিভাবে শুল্ক আদায় করত?
৮. ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের বংশধরেরা এখন কোথায় বাস করে?
৯. ভারতবর্ষে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের বংশধর কারা?
১০. মহেঞ্জোদড়ো কথাটির অর্থ কী?
১১. ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতার নাম কী?
১২. মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য কী?
১৩. সিন্ধু সভ্যতার আমলের মানুষদের প্রধান খাদ্যশস্য কি ছিল?
১৪. পঞ্চনৃপতির যুগের চীনের প্রথম রাজার নাম বলো।
১৫. প্রাচীন চীনের ইতিহাসে কোন্ বিষয় বিশেষভাবে নজরে পড়ে?
১৬. নদীমাতৃক সভ্যতার যুগে নতুন অর্থনীতির মূলে কী ছিল?
১৭. নদীমাতৃক সভ্যতার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের নাম করো।

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহ যুগের সমাজ

লোহার আবিষ্কার ও তার প্রতিক্রিয়া ঃ মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের পর আসে লৌহ যুগ। ইতিহাসে যুগ-পরিবর্তন সহসা একদিনে ঘটেনি। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব বারোশ অব্দ পর্যন্ত নিকটপ্রাচ্য দেশসমূহে ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা টিঁকে ছিল। অতএব ঐ সময়ের পর থেকে লৌহ যুগের সূচনা ধরা যেতে পারে। তবে লোহার প্রচলন সর্বত্র একই সময়ে হয়নি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এর ব্যবহার শুরু হয়। আশ্চর্যের বিষয় ভূত্বকের নিচে যে জিনিস অঢেল পরিমাণে ছড়িয়ে ছিল, তার খোঁজ পেতে মানুষের এত দেরী হয়েছিল। তবে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে যে মিশর ও মেসোপটমিয়াতে কিছু পেটা লোহার ব্যহবার ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। উত্তর রোডেসিয়ায় প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো একটি লোহা ঢালাইয়ের কারখানাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

ঠিক কবে লোহার আবিষ্কার হয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে তামা এবং ব্রোঞ্জ দামী ধাতু ছিল বলে সকলের পক্ষে তামা বা ব্রোঞ্জের তৈরি যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা সহজ ছিল না। তাই সস্তা কোন ধাতুর খোঁজ করতে করতে মানুষ একদিন লোহার খোঁজ পেয়েছিল।

তামা এবং অন্যান্য ধাতুর মতো লোহাকেও একই রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বের করতে হয়। প্রাচীনকালে যন্ত্রে-তৈরি চুল্লী ছিল না বলে লোহা গলাবার মত তাপ তৈরি করা কঠিন ছিল। সর্ব প্রথম আর্মেনীয় পর্বতমালায় বসবাসকারী এক অর্ধ-সভ্য উপজাতির লোকেরাই এই ব্যাপারে যথাযোগ্য প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করে। পরে ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশের লোক লোহা ব্যবহারের কৌশল শিখে ফেলে। খ্রীষ্টপূর্ব বারোশ অব্দের পর থেকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, গ্রীস এবং সেখান থেকে ফিনিসীয় এবং এট্রুস্কানদের মধ্যে লোহার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। মিশরে বেশ কয়েক শতাব্দী পরে লোহার প্রচলন শুরু হয়। ভারতবর্ষে এবং চীনে ঠিক কবে কি ভাবে লোহার প্রচলন শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।

লোহার আবিষ্কার মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ, এই ধাতুর ব্যবহার সহজ হওয়ার ফলে কৃষি, শিল্প এবং যুদ্ধবিগ্রহে পরিবর্তন দেখা দিল। কৃষকেরা কম খরচে লোহার কুড়ুল দিয়ে জঙ্গল কেটে, লাঙল দিয়ে চাষ-আবাদের কাজ সহজে করতে পারলো। কারিগরেরা ধনীদের মুখের দিকে না তাকিয়ে সস্তায় লোহার যন্ত্রপাতি কিনে নিজেদের কারিগ র

শিল্পে ব্যবহার করতে লাগলো। পরিবহনের খরচ কমে গেল এবং দেশে উৎপাদনও আগের চেয়ে বেড়ে গেল। লোহার হাতিয়ার হাতে নিয়ে একজন সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে ব্রোঞ্জ যুগের বীর সৈনিকের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস পেল। এক কথায়, এই সস্তা নতুন ধাতুর তৈরী জিনিস ব্যবহারের অবাধ সুযোগ পেয়ে সাধারণ মানুষ নানা দিক্ দিয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান লক্ষণসমূহ ঃ লৌহ যুগে এসে সভ্যতা পৃথিবীর আরও নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজ-ব্যবস্থা পূর্বের চেয়ে আরও জটিল হয়ে ওঠে। এর কারণ কয়েকটি বড়ো ধরনের আবিষ্কার। লোহা আবিষ্কার এ যুগের সব চেয়ে বড়ো ঘটনা। তার পরেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মুদ্রা এবং বর্ণমালা আবিষ্কার। বর্ণমালার আবিষ্কারের ফলে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হলো। খ্রীষ্টপূর্ব সাতশ অব্দের আগেই গ্রীক এবং ফিনিসীয় সৈন্যরা নিজেদের নাম লিখতে পারত। ভারতবর্ষেও খ্রীষ্টপূর্ব তিনশ অব্দের পূর্বে আর্য ভাষায় লেখার জন্য বর্ণমালা তৈরী হয় এবং অন্যান্য দেশেও বর্ণমালার উদ্ভব ঘটে। ফলে, লেখার কৌশলে আমূল পরিবর্তন হয়।

মুদ্রার আবিষ্কারের ফলে আগেকার কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনে যে অসুবিধা দেখা দিত তা দূর হয়। প্রত্যেক মুদ্রার একটা বিশেষ আকৃতি ও ওজন ঠিক করে দেওয়া হলো। ধাতু যাতে ভেজাল না হয় এবং ওজন ঠিক থাকে, তার জন্য জামিনদার হল রাষ্ট্র। গ্রীক ইতিহাস থেকে জানা যায়, গ্রীসের লিডিয়া রাজ্যে খ্রীষ্টপূর্ব সাতশ অব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রথম মুদ্রার চলন হয়। প্রথম দিকে গ্রীক রৌপ্যমুদ্রা এবং পারসিক স্বর্ণমুদ্রাও ছিল উঁচু মানের। পরে গ্রীক রাষ্ট্রে কমদামী তামা এবং রুপোর মুদ্রার প্রচলন হয়।

জাতিত্ববোধের ক্রমপ্রসার ঃ লৌহযুগের প্রথম পাঁচশ বছরে সভ্যতার এলাকাসমূহ গোড়ার দিকে কিছুটা ছোট ছিল। পরে তা এমনভাবে বেড়ে যায় যা আগেকার ব্রোঞ্জযুগের দেড় হাজার বছরেও সম্ভব হয় নি। খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ শতাব্দী নাগাদ দেখা যায়, শহুরে জীবনযাত্রা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে-ওঠা শিক্ষিত সমাজের এলাকা বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে। স্পেন থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে ভারতবর্ষে গঙ্গার কূল এবং দক্ষিণ আরব থেকে ভূমধ্যসাগরের উত্তর উপকূল ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত তার সীমানা। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বেশ কয়েকটি অংশের মধ্যে জাতিভাব জেগে ওঠে। আগে এই ধরনের জাতিভাব ছিল না। সভ্যতার এলাকাকে বাড়িয়ে সভ্যতার সুযোগ-সুবিধাগুলিকে পৃথিবীর নানা অংশে ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে লৌহযুগের সমাজ-ব্যবস্থার দান প্রচুর।

● ১. ক. **ব্যাবিলন**

সিরিয়ার মরুপ্রান্তে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকা-ভূমিতে ব্যাবিলন নগর অবস্থিত। ব্যাবিলন নামটির উৎপত্তি হয়েছে 'ব্যাব-ইল্' শব্দ থেকে। এর অর্থ দেবতার নগর। একদা এই নগরটি বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পশ্চিম এশিয়ায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ব্যাবিলনের অতুলনীয় সমৃদ্ধির কথা লিখে গেছেন। মেসোপটেমিয়ার প্রসঙ্গে যে সুমেরের দেশের কথা বলা হয়েছে তার উত্তরে ব্যাবিলন ছিল এক সময় একটি গণ্ডগ্রাম। কালে কালে সেই গ্রাম উন্নতির চরম শিখরে উঠে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছে।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার কথা। আমোরাইট জাতির একজন রাজা ব্যাবিলনে বসে আক্কাড শাসন করতেন। তিনিই সুমের এবং আক্কাডকে এক করে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তার নাম রাখেন **ব্যাবিলনিয়া**। ব্যাবিলন হয় সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং প্রধান নগর।

ব্যাবিলনে প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শুমু আবুম। এই রাজবংশ প্রায় তিন শতাব্দী ধরে রাজত্ব করেছিল। তবে সিম মুবালিটের পুত্র হাম্মুরাবি সিংহাসনে বসে নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। তিনি শত্রু ও বিদ্রোহীদের দমন করে পূর্বে এলাম এবং উত্তরে আসিরিয়াকে দখলে এনে সাম্রাজ্যের সীমানা ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি তেতাল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। হাম্মুরাবির আইন-সংকলন বা কোড তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এর আগে পৃথিবীর আর কোন দেশে সমাজের সমস্ত সমস্যার দিকে নজর রেখে এমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে আইনের ধারা তৈরী হয় নি। সেইজন্য ব্যাবিলনিয়ার ইতিহাসে হাম্মুরাবির রাজত্বকালকে স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে।

চাষ-বাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ ব্যাবিলনবাসীরা ছিল মূলে কৃষি এবং বাণিজ্য-নির্ভর জাতি। বেশির ভাগ জমিতে প্রজা অথবা দাসশ্রেণীর মানুষদের দিয়ে চাষ-বাস করানো হতো। কিছু কিছু জমি আবার জমির মালিক চাষ করত। চাষের কাজে লাঙল ব্যবহার করা হতো। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চৌদ্দশ বছর আগেকার সীলমোহরে লাঙল দিয়ে জমি চাষের ছবি দেখতে পাওয়া গেছে। ছবিতে দেখা যায়, এক জোড়া বলদ লাঙল টানছে, একজন লাঙলের মুঠি ধরে আছে, একজন বলদ তাড়াচ্ছে, অন্য একজন লোক চোঙার মতো একটা জিনিসের ভিতর থেকে জমিতে বীজ বুনছে। বীজ বোনার আগে জমিকে ছোট ছোট আকারে ভাগ করা হতো। নদীর জল বেড়ে যাতে ক্ষেত-

খামার ডুবিয়ে না দেয়, সেইজন্য উঁচু মাটির আল তুলে জমিকে বাঁচানো হতো। বন্যার জল খাল কেটে ধরে রাখবার ব্যবস্থা ছিল। প্রয়োজন মতো সেই জল সেচের কাজে লাগানো হতো। সেচের জন্য নদী বা খাল থেকে জল তোলবার জন্য এক ধরনের যন্ত্রের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। সুজলা জমি সহজেই সুফলা হয়ে উঠত।

ব্যবসা-বাণিজ্যেও ব্যাবিলন যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। আসলে ব্যাবিলন হয়ে উঠেছিল নিকট প্রাচ্যের সর্বজনীন বাণিজ্য-কেন্দ্র। এই কেন্দ্রীয় বাজারে পূর্বদেশের ইরান এবং ভারতবর্ষ, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী নানা দেশের সঙ্গে ব্যাবিলনের পণ্যদ্রব্যের বেচা-কেনা চলত। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য চলত তুলোজাত জিনিস নিয়ে, আর পশ্চিম দেশের সঙ্গে চলত মাটির পাত্রের ব্যবসা। তাছাড়া দামী পাথর কাটা, তামার কাজ, সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতিতে ব্যাবিলনীয়দের খুব সুনাম ছিল। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের দরুন ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর মূলধন জমে ওঠে। এর ফলে সমাজে এক শ্রেণীর সুদখোর মহাজনের উদ্ভব ঘটে। তারা সাধারণ মানুষকে চড়া সুদে ধার দিত। তখনও মুদ্রার প্রচলন হয় নি। রুপোর বিনিময় ব্যাপক আকারে প্রচলিত হয়েছিল। জলপথ এবং স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। জলপথের বাহন ছিল নৌকা, জাহাজ এবং ভারবাহী ভেলা। আর স্থলপথে চাকাওয়ালা গাড়ি, সেই গাড়ি টানত গাধা। আরও বেশ কিছুকাল পরে ব্যাবিলনিয়ায় ঘোড়ার আমদানি হয়।

মন্দির ও পুরোহিতবর্গ ঃ মানুষের ধর্মবিশ্বাস থেকেই মন্দির এবং দেবতার পূজার্চনার জন্য পুরোহিতরা সমাজে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। ব্যাবিলনের ইতিহাসে দেখা যায়, সেখানকার অধিবাসীদের মনে ধর্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। সেইজন্য যেমন অসংখ্য মন্দির গড়ে উঠেছিল, তেমনি পুরোহিতেরাও অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল।

সুমেরীয় যুগের জিগ্‌গুরাট ছাড়াও নাগরিকদের বাড়িতে একটি করে ছোট মন্দির বা পূজার ঘর থাকত। সেখানে দেবতার মাটির মূর্তি তৈরি করে তাঁর পূজা করা হতো। নগরদেবতা তো ছিলেনই, তা ছাড়া ছিলেন গৃহ-দেবতা। লোকে বিশ্বাস করতো তাঁর কৃপা ছাড়া মানুষের জীবনে উন্নতি করা সম্ভব ছিল না। দেশে কর আদায় করা হতো দেবতার নামে এবং তা মন্দিরের কোষাগারে জমা হতো।

পুরোহিতদের এমন প্রতাপ ছিল যে তারা কর্তৃত্ব না দেওয়া পর্যন্ত রাজারা জনসাধারণের কাছ থেকে উপযুক্ত রাজমর্যাদা পেতেন না। পুরুষানু-

ক্রমে মন্দিরের সম্পত্তি ক্রমশঃ বেড়েই চলত। রাজারা দেবতার কৃপা পাবার জন্য মন্দির তৈরি করিয়ে উপযুক্ত আসবাবপত্র, খাদ্য এবং সেবাদাস মন্দিরকে দান করতেন। অগাধ ভূসম্পত্তি দেবতার নামে দানপত্র করে দিয়ে মন্দির-গুলির জন্য নির্দিষ্ট বার্ষিক আয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন। পুরোহিতেরা ঐ সম্পত্তির আয়কে মূলধন হিসাবে নিয়োগ করে নিজেরা বড়ো বড়ো কৃষিবিদ্, পণ্য-উৎপাদক এবং মূলধন বিনিয়োগকারী হয়ে উঠেছিল।

মারদুক ছিলেন ব্যাবিলনের নগর-দেবতা ; তিনিই সকলের রক্ষাকর্তা, দেবাদিদেব। মানুষের অফুরন্ত কল্পনার বলে ব্যাবিলনে অসংখ্য দেবতার উদ্ভব ঘটেছিল। কারণ প্রত্যেক শহর ও গ্রামের একজন করে স্থানীয় রক্ষক দেবতা ছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরাণ্ট জানিয়েছেন যে, দেবতার সংখ্যা গণনার জন্য খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে একবার আদমসুমারী হয়। তাতে ৬৫,০০০ দেবতার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। দেবতার সংখ্যা দেখে মন্দির এবং পুরোহিতদের সংখ্যাও সহজেই অনুমান করা চলে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ছিল আসলে কৃষি ও বাণিজ্যিক সভ্যতা। কিন্তু তাহলেও ব্যাবিলনবাসীরা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। ধর্মমন্দিরগুলি ছিল শিক্ষাদানের কেন্দ্র। সেখান থেকেই গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো। আমাদের দেশে এক সময় যেমন 'কুড়ি'কে একক সংখ্যা ধরে গণনা করা হতো, সুমেরীয় সভ্যতার যুগেও তেমনি 'ষাট'কে একক সংখ্যা ধরে গণনার রীতি প্রচলিত হয়। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার যুগে এই রীতি বহাল থাকে। তা ছাড়া ব্যাবিলনীয় মন্দিরের পণ্ডিতেরা ভগ্নাংশে গণনার কৌশলও বের করেছিলেন। সংখ্যাকে অবশ্য তাঁরা বিভিন্ন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করতেন। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ও রহস্য আবিষ্কারের জন্য জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা ব্যাবিলনীয় সভ্যতার একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। গ্রীকরা ব্যাবিলনবাসীদের কাছ থেকেই জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করেছিল। জিগ্গুরাটের চূড়াকে প্রেক্ষণাগার হিসাবে ব্যবহার করা হতো। মাসকে সপ্তাহ এবং সপ্তাহকে বারো ভাগ করে দিনের হিসাব করবার গৌরব ব্যাবিলনবাসীদেরই প্রাপ্য। পুরোহিতেরা জ্যোতিষ বিদ্যার সাহায্যে ভাগ্য গণনার কৌশলও আবিষ্কার করেছিল।

ব্যাবিলনীয়রা এক ধরনের কীলক-আকার চিত্রাক্ষর আবিষ্কার করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দেড় হাজার বছর আগে উগারিটের পুরোহিত এবং সওদাগরেরা এর মধ্যে ঊনত্রিশটি অক্ষর বেছে নেয়। এই অক্ষরগুলিতে ধ্বনি আরোপ করে এরা সত্যিকার এক বর্ণমালা গড়ে তোলে। ব্যাবিলনীয়রা কাঁচা মাটির

চাকতির উপর সরু নরুন বা পেন্সিলের মত জিনিস দিয়ে লিখত। লেখা শেষ হলে চাকতিগুলি শুকিয়ে আগুনে সেঁকে মজবুত ইটের মতো করত। এইরকম বারোখানি ভাঙা মাটির চাকতির উপরে লেখা প্রায় তিন হাজার পঙ্‌ক্তির একখানি মহাকাব্য পাওয়া গেছে। তার নাম **গিলগামেশ-মহাকাব্য।** এই মহাকাব্যটি ব্যাবিলনের সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এছাড়া সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পচর্চারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। মন্দিরে এবং রাজপ্রাসাদে অর্কেস্ট্রা বাজানো হতো, গায়কেরা গান করত। দেওয়ালের শোভা বাড়ানোর জন্য চিত্রকলার ব্যবহার হতো।

হাম্মুরাবির আইন সংকলন বা কোড ঃ ব্যাবিলনের যে সমস্ত প্রাচীন দলিল পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে রাজা হাম্মুরাবির আইন-সংকলন বা কোড সবচেয়ে প্রাচীন। এই কোড পাথরের উপর খোদাই করে লেখা। ছবিতে দেখা যায়, সূর্যদেব সামাসের সামনে হাম্মুরাবি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সামাস তাঁকে আইন-গ্রন্থ বা কোড দান করছেন। রাজার কাছ থেকে ন্যায়বিচার লাভ যে রাজ-অনুগ্রহ নয়, প্রজার ন্যায্য অধিকার, হাম্মুরাবির আইন-গ্রন্থ বা কোডে তার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। কোডের ধারাগুলি, বিষয়ানুসারে নানা ভাগে বিভক্ত। ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূমি-স্বত্ব, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, নারীর অধিকার, চিকিৎসা বিষয়ক বিধান—এমনি নানা বিষয়। দোষীর কঠোর শাস্তি, গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড, চিকিৎসকের ফি, শ্রমিকদের মজুরি এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি প্রভৃতি বিষরক বিধানও ছিল। তবে রাজার বা রাষ্ট্রের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাহলেও সেই সুদূর অতীতে হাম্মুরাবির কোড আইনের বলে জনসাধারণের যে পরিমাণ অধিকার রাষ্ট্র মেনে নিয়েছিল, তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য।



সূর্যদেব সামাস হাম্মুরাবিকে আইন-গ্রন্থ দান করছেন

হাম্মুরাবির কোডে আভাসিত সমাজের প্রকৃতি ঃ হাম্মুরাবির কোড থেকে জানা যায়, ব্যাবিলনের সমাজে তিন শ্রেণীর মানুষ ছিল—আমেলু বা উচ্চ শ্রেণী, মুসীকনু বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং আরদু বা নিম্ন অর্থাৎ ক্রীতদাস শ্রেণী। জমিদার, রাজকর্মচারী প্রভৃতি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর লোক। এঁরা বংশানুক্রমে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা ভোগ করতেন। এই ব্যবস্থা এক ধরনের

জাতিভেদের সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ মধ্যবিত্ত ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক। সব চেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর লোক অর্থাৎ ক্রীতদাসদের। এরা ছিল উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সম্পত্তিবিশেষ। এদের কঠোর কায়িক পরিশ্রমের কাজ করতে হতো। তাছাড়া বাজারে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী কেনাবেচা চলত।

অপরাধের শাস্তি বিধানের ব্যাপারে তারতম্য ছিল। একই ধরনের অপরাধে উচ্চশ্রেণীর লোকের বেলায় হাল্কা শাস্তি আর অন্য শ্রেণীর বেলায় তার চেয়ে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। কখনও কখনও পিতার অপরাধে পুত্রের শাস্তি হতো। ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ লিখিত চুক্তির দ্বারা করার নিয়ম ছিল। বিচারের বিবরণ নথিবন্ধ করা হতো। সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকলেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদও করা চলত। অনেক সময় মহিলারা দেবমন্দিরে সেবাদাসী হয়ে কাজ করতেন। সেবাদাসীদের মধ্যে বড়ো ঘরের মহিলা, এমনকি রাজকন্যাও থাকতেন।

হাম্মুরাবির আমলে ব্যাবিলন উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। তিনি একই ভাষার বন্ধনে সারা জাতিকে একতাবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই ব্যাবিলনের পতনের সূচনা হয়। ব্যাবিলনের উপর বিদেশী ক্যাসাইটদের হামলা চলতে থাকে। নানাভাবে ভাগ্য বিপর্যয়ের পর ব্যাবিলনে শেষ পর্যন্ত ক্যাসাইটদের রাজত্ব কায়েম হয়।

খ. মিশরে সাম্রাজ্য-শক্তির অভ্যুদয়

মিশরের ইতিহাস অসংখ্য রাজার নামের তালিকায় ভরা। পৃথিবীর আর কোন প্রাচীন দেশে রাজারা সংখ্যায় এত বেশী ছিলেন না। সেইজন্য ঐতিহাসিকরা বংশানুক্রমে রাজবংশগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলাদা আলাদা নাম দিয়েছেন। প্রথম থেকে ষষ্ঠ রাজবংশের রাজত্বকালকে **প্রাচীন যুগীয় রাজ্য** এবং একাদশ থেকে চতুর্দশ রাজবংশের রাজত্বকালকে **মধ্য যুগীয় রাজ্য** নাম দিয়েছেন। এরপরে দুশো বছর হিকসসদের অধীনতার যুগ। অষ্টাদশ থেকে বিংশ রাজবংশের রাজত্বকালকে **নব্যযুগীয় রাজ্য** বলা হয়। এই সময়েই মিশরে সাম্রাজ্যশক্তির অভ্যুত্থান ঘটে।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ষোল শ বছর আগে থিবির শাসক আহ্‌মোস বিদেশী শাসকদের তাড়িয়ে মিশরে নব্য যুগীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকে অষ্টাদশ রাজবংশের সূচনা এবং ইতিহাসের পাতায় সাম্রাজ্য-শক্তি হিসাবে মিশরের অভ্যুদয়।

উপনিবেশসমূহ ঃ নতুন সাম্রাজ্যের ফ্যারাওরা ছিলেন সামরিক রাষ্ট্রের সামরিক শাসক। সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়াবার জন্য তাঁরা পররাজ্য জয়ের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরা সিরিয়া এবং ফিনিসিয়া জয় করেন। এশিয়া মাইনরে হিটাইট সাম্রাজ্য ও তার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের মিটানির আর্য শাসকদের যুদ্ধে পরাভূত করে লিবিয়ার মরুভূমি এবং ইথিয়োপিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত মিশরের শাসনাধীনে আনেন। এ সমস্তই কার্যতঃ মিশর সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হয়। মিশরের এই সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এশিয়া ভূখণ্ডেও তার উপনিবেশ গড়ে ওঠে। প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়া থেকে শুরু করে সাইপ্রাস পর্যন্ত মিশর সাম্রাজ্যের উপনিবেশ বিস্তৃত হয়। ফলে, রাজকোষও পর্যাপ্ত পরিমাণ ধনদৌলতে ভরে ওঠে।

অষ্টাদশ রাজবংশের ফ্যারাও তৃতীয় থাটমোসের আমলে মিশর নানাদিক্ থেকে উন্নতির চরম শিখরে ওঠে। এই যুগ মিশরে স্থাপত্য কলারও সেরা যুগ। কার্নকে য়্যামন দেবতার মন্দিরটি মিশরীয় স্থাপত্যকলার আশ্চর্য নিদর্শন। অতুলনীয় ঐশ্বর্যের জাঁকজমকের ভিতর দিয়ে মিশর সাম্রাজ্যের দুশো বছর কেটে যায়। তারপর থেকেই বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। ঊনবিংশ রাজবংশের ফ্যারাওরা বিদেশে মিশরের আগেকার সম্মান বজায় রেখে চলতে অপরাগ হন। ফলে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ শেষ হবার আগে থেকেই একটি একটি করে উপনিবেশ মিশরের অধীনতা থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে।



ফ্যারাও ইখ্নাটন সূর্য-দেবতা আটন-এর পূজা করছেন

পুরোহিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ঃ প্রাচীন মিশরে ধর্মের প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। দেশের শাসনতন্ত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা সর্বত্রই ধর্মের প্রভাব পড়েছে আর এই ধর্মকে অবলম্বন করেই পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে। কালে কালে পুরোহিতরা অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু

প্রাচীনকাল থেকেই মিশরের ফ্যারাওয়ের ক্ষমতা পুরোহিতের চেয়ে বেশী। ফ্যারাও ছিলেন আসলে প্রধান পুরোহিত এবং তিনিই ধর্মীয় মিছিল পরিচালনা করতেন। ধর্মীয় উৎসবসমূহে তাঁরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু তা হলেও পুরোহিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা কোনক্রমে কম ছিল না। মধ্য রাজত্বের শক্তিশালী ফ্যারাও ইখ্‌নাটন পুরোহিতদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

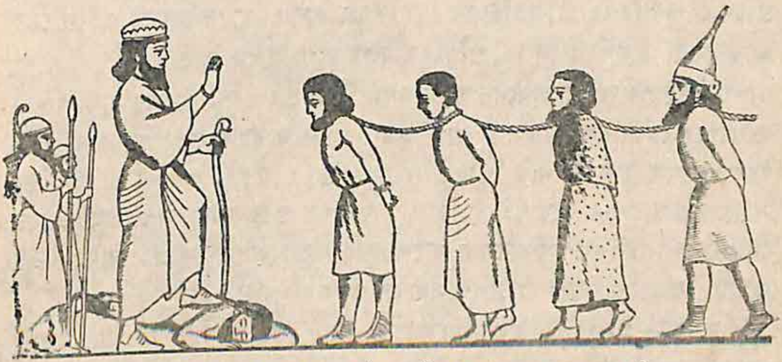
পুরোহিতরাই ছিল রাজ-সিংহাসনের প্রধান খুঁটি। সামাজিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে পুরোহিতরাই গুপ্ত পুলিসবাহিনীর কাজ করত। পুরোহিতের পদ ছিল বংশগত। জনগণের ধর্মানুরাগ এবং রাজাদের উদারতার সুযোগে কালে কালে পুরোহিতশ্রেণী অভিজাত সামন্তদের এবং রাজ-পরিবারের চেয়েও ক্ষমতায় বড়ো হয়ে ওঠে। তারা মন্দিরে বাস করে দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করত। তাদের কর দিতে হত না। বাধ্যতামূলক শ্রমদান কিংবা সামরিক চাকরিতে যোগদানের আইন থেকে তাদের রেহাই ছিল। মিশরের শিক্ষা-দীক্ষা পুরোহিতদের হাতেই ছিল। তারাই যুবকদের নিয়ম ও শৃংখলা শিক্ষা দিত।

● গ. ইরান

পারস্যের অভ্যুত্থান ঃ পূর্বে সিন্ধু নদ, পশ্চিমে টাইগ্রিস নদী—এই দুই নদ-নদীর মাঝখানে যে বিশাল মালভূমি রয়েছে, তার ত্রিভুজাকৃতি অংশ হচ্ছে ইরান দেশ ; প্রাচীন নাম আইরন অর্থাৎ আর্য। এর উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগর। পূর্ব দিকে আফগানিস্তান ও বালুচিস্তান, পশ্চিমের ভূখণ্ড ইরান নামে পরিচিত। ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ফারস নামে একটি প্রদেশ আছে। এর প্রাচীন নাম ছিল পারসা। এই নাম থেকেই দেশের নাম হয়েছিল পার্সিয়া বা পারস্য। এই অঞ্চলে আর্য জাতির একটি শাখা এসে বসবাস শুরু করে। কালে কালে তারা আরও দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ে এবং পারসিক নামে পরিচিত হয়।

আকিমিনিয় রাজবংশ ঃ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস পারসিকদের নানা উপজাতির নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছিল পাসারগাদে উপজাতি। এরাই একসময় প্রবল হয়ে পারস্যের আকিমিনিয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল আকিমিনিস। এই রাজবংশের রাজা কাইরাস বা কুরুশের রাজত্বকালেই পারসিকরা ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করে।

কাইরাস মিডীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করে মিড এবং পারসিকদের নিয়ে এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি আসিরিয়া, ব্যাবিলন, লিডিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি একের পর এক দেশ জয় করে পারস্য সাম্রাজ্যের সংগে যুক্ত করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রোমক সাম্রাজ্যের আগে পৃথিবীতে এত বড়ো সাম্রাজ্য আর কেউ গড়ে তুলতে পারে নি। দীর্ঘদিন বেঁচে থেকেও তিনি সাম্রাজ্যকে সুগঠিত করে যেতে পারেন নি।



বেহিস্তানের পাহাড়ের গায়ে খোদিত দারিয়ুসের যুদ্ধজয়ের স্মারকচিত্র

কাইরাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ক্যাম্বিসেস সিংহাসনে বসেন। তিনিও ছিলেন বড়ো যোদ্ধা। মিশর জয় করে তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে আনেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং আধা-পাগল গোছের মানুষ। পিতার সহ্যশক্তি বা উদারতা কোনটাই তাঁর ছিল না। তাই তাঁর শাসনকালের কয়েক বছরের মধ্যে চারিদিকে অশান্তি ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ক্যাম্বিসেস আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি পান।

দারিয়ুস ঃ সেই বিদ্রোহ দমন করে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজন পারস্যের সিংহাসনে বসেন। তাঁর নাম দারিয়ুস। এঁর সময় থেকে পারসিক সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়।

দারিয়ুসের আমলে পারসিক সাম্রাজ্যের সীমানা আরও বড়ো হয়। মিশর থেকে শুরু করে হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে পাঞ্জাবের বিতস্তা নদী পর্যন্ত পারসিক সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। দারিয়ুস তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে কুড়িটি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রত্যেক প্রদেশের অসামরিক ও সামরিক প্রশাসনিক ক্ষমতা ভিন্ন ব্যক্তির হাতে তুলে দেন। রাজধানী সুসাতে একজন উচ্চপদস্থ

রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন। তিনি সম্রাটের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার তদারকি করতেন। দারিয়ুস ছিলেন উদার স্বভাবের মানুষ। তাঁর আমলে লোকেরা নিজেদের ধর্ম ও আচার-ব্যবহার স্বাধীনভাবে পালন করতে পারত। তিনি তাঁর সমস্ত যুদ্ধজয়ের চিত্র ও কাহিনী বেহিস্তানের একটি উঁচু পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে রেখে গিয়েছিলেন।

শেষ জীবনে দারিয়ুসের মনে গ্রীস জয়ের বাসনা জাগে। হেরোডোটাস-এর লেখা গ্রীসের ইতিহাস থেকে জানা যায়, তিনি তাঁর এক রানীর প্ররোচনায় গ্রীসে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দুবার যুদ্ধে নেমেও দারিয়ুসের মনোবাসনা পূর্ণ হয় নি। গ্রীকদের সঙ্গে দারিয়ুসের দ্বিতীয়বার যে যুদ্ধ হয় ইতিহাসে তা ম্যারাথনের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত। দারিয়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জেরাক্সেস পারস্যের সম্রাট্ হন। ম্যারাথনের যুদ্ধের দশ বছর পরে বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। এর পরেও পারসিক সাম্রাজ্য প্রায় দেড়শ বছর টিঁকে ছিল। তারপর গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় যাত্রাপথে আরবেলার যুদ্ধে পারস্যের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পরেই পারসিক সাম্রাজ্য গ্রীসের পদানত হয়।

জরথুস্ত্র: প্রাচীন ইরানীরা বহু দেবতায় বিশ্বাসী ছিল। আগে তারা নানা দেবদেবীর পূজার্চনা করত। খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার থেকে পাঁচশ অব্দের মধ্যে জরথুস্ত্র নামে এক ধর্মগুরুর আবির্ভাব ঘটে। তিনি এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। এই ধর্মমত অনুসারে ঈশ্বর এক—তাঁর নাম আহুরা-মাজদা। তিনি স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর এবং আলোকের দেবতা। জরথুস্ত্রের ধর্মমত প্রচারের ফলে পারসীদের বহু দেবতায় বিশ্বাস ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রভাব নির্মূল হয়ে যায়। কারণ এই ধর্মে মূর্তিপূজা বা মন্দিরের কোন স্থান ছিল না। পাহাড়ের চূড়ায়, রাজপ্রাসাদে অথবা নগরের মাঝখানে বেদী তৈরি করে তার উপর আহুরা-মাজদার সম্মানে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হতো। আগুনকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হতো। এই জন্য জরথুস্ত্রের ধর্মমতে বিশ্বাসী পারসীরা অগ্নি-উপাসক বলে পরিচিত।

জরথুস্ত্রের মতে জগতে সব সময় মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বন্দ্ব চলছে। মানুষের আত্মার মধ্যেও চলছে অহরহ ভালো-মন্দের লড়াই। এ সমস্তই হচ্ছে ঈশ্বর এবং শয়তানের কারসাজি। শয়তানদের নায়ক হচ্ছে অহিমান। জগতে কখনও আহুরা-মাজদা, কখনও বা অহিমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এইভাবে তিন হাজার বছরের চারটি যুগ কেটে যাবে। তারপর অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটবে এবং শুভ শক্তির জয় হবে। সেই সময় সব পুণ্যাত্মা মানুষেরা স্বর্গে গিয়ে আহুরা-মাজদার সঙ্গে মিলিত হবে।

জরথুষ্ট্রের তিরোধানের পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অমূল্য নীতি-শিক্ষাগুলি সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে গ্রথিত করেন। সেই পুস্তকের নাম আবেস্তা অর্থাৎ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ। আবেস্তার বাণীতে বলা হয়েছে মানুষের প্রধান কর্তব্য তিন প্রকার: ১. শত্রুকে বন্ধু করে তোলা, ২. দুষ্ট প্রকৃতির মানুষকে ন্যায়পরায়ণ করা এবং ৩. অজ্ঞ মানুষকে বিজ্ঞ করা। মানুষের সবচেয়ে বড়ো ধর্ম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কথায়-কাজে সাধুতা। আর ভক্তি-শ্রদ্ধাই যখন সেরা ধর্ম, তখন মানুষের জীবনের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে শুদ্ধ চিত্তে ত্যাগ ও প্রার্থনার সাহায্যে ভগবানের পূজা করা।

ভারতবর্ষে যে পারসী সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করেন, তাঁরা প্রাচীন ইরানীদের বংশধর। তাঁরা জরথুষ্ট্রের ধর্মমত অনুসারে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন।

● ঘ. ইহুদীগণ

আরব মরুভূমির মাথার উপর এক সংকীর্ণ শ্যামল ভূখণ্ড পারস্য উপসাগর পর্যন্ত চলে গেছে। সেই ভূখণ্ডের পশ্চিম দিকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে প্যালেস্টাইন নামে একটি দেশ ছিল। প্যালেস্টাইনের প্রাচীন নাম 'ক্যানান'। কেউ কেউ এই দেশকে 'জুড়িয়া' বলেও উল্লেখ করেছেন। প্যালেস্টাইনের সঙ্গে ইহুদী জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস জড়িত হয়ে রয়েছে। কারণ প্যালেস্টাইন ছিল ইহুদীদের কাছে 'প্রতিশ্রুত দেশ'। ঈশ্বর নাকি ইহুদীদের পূর্ব পুরুষ আব্রাহামকে বলেছিলেন যে, প্যালেস্টাইন ইহুদীদের দেশ হবে। বর্তমানে প্যালেস্টাইনের সমুদ্রতীরের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে ইজরায়েল নামে ইহুদীদের স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েছে।

প্রাচীন কালে ব্যাবিলনিয়ায় ইউফ্রেটিস নদীর মুখে উর নামে একটি জায়গা ছিল। সেখানে সেমিটিক উপজাতির একদল লোক বাস করত। মেষপালন ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। খ্রীষ্টপূর্ব বিংশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে ওরা আদি বাসভূমি ত্যাগ করে ব্যাবিলনিয়ায় নতুন পশুচারণ ভূমির সন্ধান করতে আসে। কিন্তু ব্যাবিলনিয়ার সৈন্যরা ওদের হটিয়ে দেয়। তখন ওরা নিরাপদে তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে পারে, এমন একটি জায়গার খোঁজে পশ্চিমদিকে হাঁটতে শুরু করে।

মিশরে হিব্রুগণ: এই মেষপালক উপজাতির মানুষরাই হিব্রু বা ইহুদী জাতি নামে পরিচিত। অনেক দিন ধরে দল বেঁধে দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ওরা মিশর দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। হিব্রুরা প্রায় পাঁচশ

বছর যাবৎ মিশরে বাস করেছিল। এর ফলে মিশর ওদের কাছে স্ব-দেশের মতোই হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হিকসস্ নামে বর্বর উপজাতির লোকেরা যখন মিশর আক্রমণ করে, তখন ওরা বিদেশী আক্রমণকারীদের সাহায্য করে। এর ফলে মিশরে হিকসস্দের প্রভুত্বকালে ওরা কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা পেলেও মিশরবাসীদের চরম বিরাগভাজন হয়ে পড়ে।

যুদ্ধে মিশরীয়দের কাছে হেরে গিয়ে হিকসস্রা যখন মিশর ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো, তখন থেকেই মিশরীয়দের হাতে হিব্রুদের নির্যাতনের পালা শুরু হলো। হিব্রুদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হলো। বড়ো বড়ো রাস্তা-ঘাট, পিরামিড ইত্যাদি তৈরির কঠিন কাজে জোর করে তাদের নিযুক্ত করা হতে লাগল। কিন্তু এতেও ওরা রেহাই পেল না। ফ্যারাওর নির্দেশে হিব্রুদের ঘরে পুত্রসন্তান জন্মালে তখনই তাকে মেরে ফেলা হতে লাগল। অথচ পালিয়ে যাবার পথেও মিশরীয় সেনাবাহিনীর কড়া পাহারা। এইভাবে ওরা বহু বছর যাবৎ মুখ বুঁজে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে লাগল।

মোজেসের নেতৃত্বে হিব্রুদের নিষ্ক্রমণ—দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ : এমন সময় মোজেস বা মুসা নামে একজন তরুণ ইহুদী মিশরের নির্যাতিত হিব্রু বা ইহুদীদের পরিত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হলেন। বহুদিন ধরে মরুভূমিতে বাস করে মোজেসের পিতৃপুরুষেরা অনাড়ম্বর নীরস রুক্ষ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। নগর-জীবনের কৃত্রিম পরিবেশের উপর ছিল তাঁর গভীর বিতৃষ্ণা। তিনি মিশরে স্বজাতি নির্যাতনের করুণ কাহিনী শুনেছিলেন। মোজেস মিশর থেকে হিব্রুদের সরিয়ে আনবার জন্য উদ্যোগী হলেন। তিনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে স্বজাতিদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে এলেন। খবর পেয়ে ফ্যারাওয়ের সৈন্যরা পিছনে তাড়া করল। কিন্তু তিনি অলৌকিক উপায়ে মিশরীয় সৈন্যদের আক্রোশ এড়িয়ে এদের নিয়ে সিনাই পর্বতের সমতলভূমিতে পৌঁছলেন। বিপদ থেকে মুক্ত হিব্রু নরনারীরা আনন্দে নাচগান করল।

এবার তাদের শুরু হলো নিরালা মরুভূমির মধ্যে যাযাবর জীবন যাপন। এই সময় মোজেস 'আব্রাহামের ঈশ্বর'কে উপলব্ধি করলেন। ইনি হলেন 'বজ্র ও ঝঞ্ঝাবাত্যার দেবতা'। ইনি মহাকাশ শাসন করেন, রাখালদের জীবন এঁরই কৃপার উপর নির্ভরশীল। ওই দেবতার নাম 'জাভে' বা জিহোভা (Yaveh বা Jehova)। মোজেসের শিক্ষায় ইনিই হিব্রু জাতির জাতীয় দেবতা হয়ে ওঠেন।

একদিন দেবানুগৃহীত মোজেস হিব্রুদের শিবির ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন। সেইদিনই বিকাল বেলায় দেখা গেল, সিনাই পর্বতের চূড়া ঘন

ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে, কিছুই দেখা যায় না। চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত পাহাড়ের চূড়ায় কাটিয়ে মোজেস যখন নেমে এলেন, তখন তাঁর হাতে দুটি পাথরের ফলক দেখা গেল। বজ্রগর্জন ও বিদ্যুৎ ঝলকানির মধ্যে জাভে হিব্রু বা ইহুদী জাতির উদ্দেশে যে দশটি বাণী দিয়েছিলেন, সেই ফলক দুটিতে তা লেখা ছিল। সেগুলি 'প্রত্যাদেশ দশক' নামে বিখ্যাত। তখন থেকে জাভে ইহুদীদের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠলেন।

তারপর মোজেস আবার সদলবলে মরুপথে যাত্রা শুরু করলেন। অনুগত সহচরদের নিয়ে অনেক বছর ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক মনোরম ও সমৃদ্ধিশালী দেশে গিয়ে পেঁছিলেন। দেশটির নাম প্যালেস্টাইন। সেখানে তখন ক্যানানাইট নামে সেমিটিক উপজাতির অন্য একটি শাখার মানুষ বাস করত। ইহুদীরা বলপ্রয়োগ করে সেখানে ঢুকে নিজেকের মতো নগর তৈরি করল। নগরে একটি প্রকাণ্ড মন্দির তৈরি করে সেই নগরের নাম দিল জেরুজালেম অর্থাৎ শান্তির আবাস।

অল্পদিনের মধ্যেই মোজেস ইহধাম ত্যাগ করলেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার ঈশ্বরের আজ্ঞায় জোসুয়ার উপর বর্তাল। মোজেস ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা স্বজাতীয়দের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছিলেন। পৃথিবীতে ইহুদীরাই প্রথম এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী জাতি।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১. লৌহ যুগের সমাজ ব্যবস্থায় যে সমস্ত পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২. লৌহ আবিষ্কার মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা কেন?
৩. ব্যাবিলন নগরীটি কোথায় এবং কিভাবে গড়ে ওঠে সংক্ষেপে বিবৃত করো।
৪. ব্যাবিলনবাসীরা চাষ-আবাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির জন্য কী। ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল?
৫. ব্যাবিলনবাসীদের জীবনে পুরোহিতদের প্রভাব সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বিবৃত করো।
৬. ব্যাবিলনবাসীদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে যা জানো গুছিয়ে লেখ।

৭. হাম্মুরাবির আইন-সংকলন বা কোডে সমাজের যে প্রকৃতি আভাসিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।
৮. ব্যাবিলনের পতন সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বিবৃত করো।
৯. মিশরে কিভাবে সাম্রাজ্য-শক্তির অভ্যুদয় ঘটে তা সংক্ষেপে বিবৃত করো।
১০. মিশরে সাম্রাজ্য-শক্তির উদ্ভবের ফলে ফ্যারাওরা কিভাবে উপনিবেশ বিস্তৃত করে সংক্ষেপে বলো।
১১. কী কারণে এবং কখন থেকে উপনিবেশগুলি মিশরের অধীনতা থেকে বেরিয়ে যায়?
১২. প্রাচীন মিশরে পুরোহিতদের ক্ষমতার বিবরণ দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।
১৩. ইরান দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
১৪. পারসিক সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও পতনের কাহিনী নিজের ভাষায় বিবৃত করো।
১৫. পারসিক সম্রাট্ জেরাক্সেস-এর সিংহাসনে আরোহণের ঘটনা উল্লেখ করে গ্রীকদের সংগে তাঁর যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দাও।
১৬. জরথুস্ট্রের ধর্মমতে ঈশ্বরের পরিচয় কী তা উল্লেখ কর। তাঁর ধর্মমতের সার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করো।
১৭. হিব্রু বা ইহুদী জাতির পরিচয় দিয়ে মিশরবাসী ইহুদীদের অবস্থা নিজের কথায় বর্ণনা করো।
১৮. মোজেস বা মুসার নেতৃত্বে কিভাবে মিশরের নির্যাতিত ইহুদীগণ মুক্তি লাভ করেছিল, সেই কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করো।
১৯. 'প্রত্যাদেশ দশক' কাকে বলে? এ সম্পর্কে যা জানো বলো।

মৌখিক প্রশ্ন

১. আনুমানিক কোন্ সময় থেকে লৌহযুগের সূচনা ধরা হয়?
২. লৌহযুগের আগে কোন্ যুগ ছিল?
৩. 'ব্যাবিলন' নামটির উৎপত্তি হয়েছে কি করে?
৪. 'ব্যাবিলন' কথাটির অর্থ কী?
৫. ব্যাবিলনের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী?
৬. ব্যাবিলনের অতুলনীয় সমৃদ্ধির কথা লিখে গেছেন কে?
৭. ব্যাবিলনের নগর-দেবতার নাম কি ছিল?

৮. খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে যে আদমসুমারী হয়, তাতে কতজন দেবতার কথা জানা গিয়েছিল ?
৯. ব্যাবিলনে ভগ্নাংশ গণনার কৌশল কারা বের করেছিল ?
১০. ব্যাবিলনে যে প্রাচীন মহাকাব্য পাওয়া গেছে, তার নাম কি ?
১১. হাম্মুরাবির কোডে সমাজের যে তিন শ্রেণীর মানুষের উল্লেখ আছে সেই তিনটি শ্রেণীর নাম কী ?
১২. মিশরের ইতিহাসে কোন্ সময়কে 'প্রাচীন যুগীয় রাজ্য' বলা হয় ?
১৩. কাদের মেষপালক রাজা বলা হতো ?
১৪. মিশরে 'নব্য যুগীয় রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করেন কে ?
১৫. মিশরের স্থাপত্যকলার আশ্চর্য নিদর্শন কোন্‌টি ?
১৬. মিশরের শিক্ষা-দীক্ষা কাদের হাতে ছিল ?
১৭. গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস কাদের কাছ থেকে ইতিহাস রচনার মালমসলা সংগ্রহ করেছিলেন ?
১৮. ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমে কোন্ প্রদেশটির প্রাচীন নাম ছিল 'পারস্য' ?
১৯. পারসিকদের নানা উপজাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে প্রধান ছিল ?
২০. পারস্যের আকিমিনিয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
২১. গ্রীকদের সংগে দারিয়ুসের দ্বিতীয়বার যে যুদ্ধ হয়, তার নাম কী ?
২২. কোন্ যুদ্ধে পারস্যের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে ?
২৩. প্যালেস্টাইনের প্রাচীন নাম কী ছিল ?
২৪. ইহুদীদের কাছে কোন্ দেশটি 'প্রতিশ্রুত দেশ' ?
২৫. মোজেসের প্রয়াণের পর তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার কার উপর বর্তায় ?
২৬. পৃথিবীতে এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী প্রথম জাতির লোক কারা ?

দুই

গ্রীস

গ্রীসের সভ্যতার উপর ক্রীট-এর প্রভাব ঃ গ্রীস একটি প্রাচীন সভ্য দেশ। ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গ্রীসের অবস্থান। প্রাচীন গ্রীসের মানুষেরা মূল আর্য ভাষাভাষী মানব-গোষ্ঠীর একটি শাখা। গ্রীসের সভ্যতাই রোমের ভিতর দিয়ে কালে কালে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষে যেমন আর্য সভ্যতার আগে সিন্ধু সভ্যতা নামে আর একটি প্রাচীন সভ্যতা



প্রাচীন গ্রীস

গড়ে উঠেছিল, তেমনি গ্রীক সভ্যতার আগে ইজিয়ান সাগরের দ্বীপে আর একটি প্রাচীন সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। এই সভ্যতা ইজিয়ান বা ক্রীট সভ্যতা নামে পরিচিত। ইজিয়ান সাগরের ক্রীট দ্বীপ ছিল এই সভ্যতার জন্মভূমি এবং নোসাস্ ছিল ক্রীটের সবচেয়ে নামী শহর। এখানে রাজারা বাস করতেন। নোসাসের রাজারা মিনস নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতবর্ষের আর্য সভ্যতা যেমন সিন্ধু সভ্যতার কাছে নানাভাবে ঋণী, গ্রীক সভ্যতাও তেমনি ইজিয়ান সভ্যতা বা ক্রীটের সভ্যতার কাছে ঋণী।

সুদূর প্রস্তর যুগে ক্রীট দ্বীপে এই সভ্যতার সূচনা হয়। তারপর খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষের দিকে ক্রীটের উন্নতি চরমে ওঠে। এই সময়

ক্রীটের প্রস্তর যুগ শেষ হয়ে ধাতু যুগের সূচনা হয়। খননের ফলে নোসাসের মাটির তলা থেকে যে সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া গেছে, তা দেখে মনে হয় ক্রীট শুধু নৌশক্তিতে নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং শিল্পকলাতেও তারা যথেষ্ট উন্নতি করেছিল।

ক্রীটীয় শিল্পকলার সবচেয়ে বড়ো নমুনা হচ্ছে রঙবেরঙের মাটির কাজ। ক্রীটবাসীরা কাপড় বোনা, পাথর খোদাই, ছবি আঁকা, হাতীর দাঁতের কাজ, ধাতু-শিল্পের কাজ প্রভৃতিতে বিশেষ উন্নতি করে। এ ছাড়া ক্রীটের লোকেরা লিখতে জানত। তারা চিত্রলিপির সাহায্যে লিখত। অন্য কোন ইউরোপীয় জাতি এর আগে লেখার কৌশল আবিষ্কার করতে পারেনি। তবে সিন্ধু সভ্যতার লিপির মতো ক্রীটের লিপিরও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ক্রীট দ্বীপের নানা জায়গায় খননের ফলে সেখানকার শহরের জনজীবন, শিল্পকলা, নোসাসের রাজার বিরাট প্রাসাদ প্রভৃতি সভ্যতার অনেক চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব চোদ্দশ অব্দের কাছাকাছি সময়ে উত্তর ইউরোপ থেকে এক স্বল্পসভ্য জাতির লোকজন এসে ক্রীট আক্রমণ করে। সেই আক্রমণে নোসাসের পতন ঘটে, ইজিয়ান সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে, এরাই হচ্ছে গ্রীক। এই সময় গ্রীসে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তাকে মাইসেনিয়ান সভ্যতা বলা হয়। নোসাসের পতনের পর ক্রীট এই সভ্যতার অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

হোমারের যুগ ঃ ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারতের মতো প্রাচীন গ্রীসেও **ইলিয়াড** এবং **অডিসী** নামে দুখানি মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। অন্ধ কবি হোমার এই দুখানি মহাকাব্যের রচয়িতা। ট্রয়-যুদ্ধ এবং যুদ্ধে ট্রয়ের পতনের ঘটনাবলী নিয়ে ইলিয়াড ও অডিসী রচিত। এ ছাড়াও এই দুই মহাকাব্য থেকে প্রাচীন গ্রীসের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারা যায়। সে যুগে রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন রাজা। তবে তিনি নিজের খুশিমতো রাজ্য শাসন করতে পারতেন না। দেশের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে একটা পরিষদ ছিল, তার নাম **কাউন্সিল**। আর জনগণের সভার নাম ছিল **য়্যাসেম্বলি**। রাজা কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ করে যা স্থির করতেন তা জনগণের সভায় পেশ করতে হতো। রাজা, কাউন্সিল ও য়্যাসেম্বলি এই তিন অংগে বিভক্ত শাসনযন্ত্র, ইউরোপীয় সংবিধান—এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল।

হোমারের যুগে গ্রীসের লোকেরা যে লেখার কৌশল আবিষ্কার করেছিল, ইলিয়াডের বর্ণনা থেকে তা জানতে পারা যায়। সে সময় লোকে দাহ করে

মৃতদেহের সৎকার করত। পরে অবশ্য দাহ করা এবং কবর দেওয়া—দুরকম প্রথাই চালু হয়। সে যুগে কার দখলে কতগুলি পশু বা পাখী আছে, তার নিরিখে লোকের ধনসম্পদের পরিমাণ ঠিক করা হতো। জলদস্যুগিরি তেমন দোষের ছিল না। অনেক লোকে জলদস্যুতাকে ব্যবসার মতো দেখত।

নগর-রাষ্ট্র ঃ গ্রীস একটি পাহাড়েঘেরা দেশ। অসংখ্য পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর সুন্দর উপত্যকা। সেই উপত্যকার সমতলভূমির উপর ছোট ছোট নগর। পাহাড়-পর্বতের বেড়া ডিঙিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াত সহজ ছিল না। এই কারণেই সারা গ্রীসে একটিমাত্র শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে নি। প্রত্যেক নগরে একটি করে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে এবং এদের চিন্তায় ও জীবনযাত্রায় একটা বিশেষত্ব দেখা দেয়।

প্রাচীন গ্রীসে যে সমস্ত নগর-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, সেগুলির মধ্যে **এথেন্স, স্পার্টা, কোরিন্থ, থিবিস ও ম্যাসিডন** প্রধান। নগর-রাষ্ট্রই ছিল গ্রীক সভ্যতার ভিত্তি ও আদর্শ। হোমারের কাব্য থেকে জানা যায়—নগর-রাষ্ট্রের স্থান ছিল সবার উপরে। কয়েকশ' নাগরিক নিয়ে তৈরি ছোটোখাটো সমাজে পরস্পরের মধ্যে একটা জ্ঞাতিভাব বজায় ছিল। অডিসী গ্রন্থে দেখা যায়, নসিকা নামে একজন রাজকন্যা তার তরুণী সখীদের সঙ্গে কাপড় পরিষ্কার করছে। নগর-রাষ্ট্র বা পলিস নামে যে একক প্রতিষ্ঠান—একে অবলম্বন করে গ্রীসে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নাট্যোৎসব, গীতিকবিতা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানারকমের সামাজিক জ্ঞান-বিদ্যার বিকাশ ঘটেছিল।

তবে নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে ঐক্যের অভাব ছিল। অনেক সময় শত্রু সামনে দেখেও নগর-রাষ্ট্রগুলি একতাবদ্ধ হতে পারে নি। কালে কালে গ্রীসের স্বাধীনতা লোপের এটিও একটা বড়ো কারণ।

সংস্কৃতি-বিনিময় ও উপনিবেশ স্থাপন ঃ গ্রীকদের সমুদ্রযাত্রা শুরুর পর থেকেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তারা সংস্কৃতি-বিনিময় শুরু করে। ইজিয়ান সাগরের উপকূল এবং খাস গ্রীসের বাইরে তাদের বসতি বিস্তার শুরু হয়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আটশ বছর আগে কৃষ্ণসাগর ও থ্রেস-এর তীরভাগে, ইতালী, সিসিলি এবং স্পেনে গ্রীকদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। সাধারণ উপনিবেশ বলতে মূল ভূখণ্ডের অধীনে কতকগুলি অঞ্চল বোঝায়। কিন্তু গ্রীসের এই উপনিবেশগুলি তেমন ছিল না।

গ্রীকরা যেখানে গিয়ে নতুন বসতি গড়ে তুলেছে, সেখানে তারা তাদের ভাষা ও আচার-আচরণের নিজস্বতা বজায় রেখেছে। ফলে, তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি উপনিবেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। মাতৃভূমির সঙ্গে তাদের নাড়ীর

যোগ কখনও ছিন্ন হয় নি। নতুন বসতি স্থাপনের সময় তারা জাতীয় দেবতার পূজার্চনা করেছে ; বড়ো বড়ো ধর্মীয় উৎসবের সময় মাতৃভূমির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটেছে। এইভাবে বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত গ্রীক জাতির মনে একটা ঐক্যের ভাব জাগ্রত রয়েছে। এই ঐক্যবোধের জন্যেই মূল গ্রীসে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতাতে উপনিবেশগুলির হাজার হাজার গ্রীক এসে যোগ দিত।

সমুদ্রপথে বাণিজ্যের সূত্রে ফিনিসীয়দের সঙ্গে গ্রীসের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে সংস্কৃতি-বিনিময় ঘটে। বিশেষতঃ, ফিনিসীয়দের কাছ থেকে গ্রীস লেখার উপযোগী বর্ণমালা পায়। ফিনিসীয় গ্রন্থগুলিকে এরা নিজেদের ভাষার উপযোগী করে নেয়। ফিনিসীয়দের বর্ণমালায় শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল, গ্রীকরা স্বরবর্ণ যোগ করে।

● এথেন্স ও স্পার্টা

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টা গ্রীসের ইতিহাসে গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান লাভ করেছে। অথচ একমাত্র ভাষার মিল ছাড়া এই দুই নগরীর জীবনযাত্রার মধ্যে অন্য কোন মিল ছিল না। কালে কালে এথেন্স সমৃদ্ধ বাণিজ্য-নগরী হয়ে ওঠে। এখানকার জনসমাজের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। স্পার্টার ভৌগোলিক পরিবেশ কৃষির তেমন অনুকূল ছিল না। ফলে, তারা ভিন্ন উপায়ে বড়ো হবার চেষ্টা করতে লাগলো।

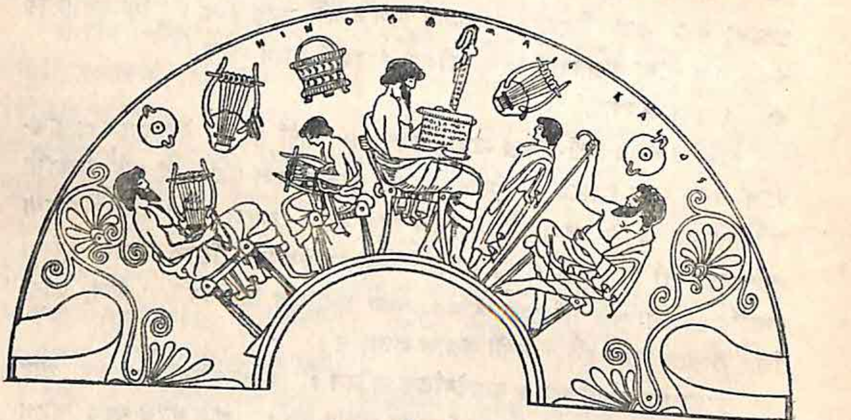
এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ঃ যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগে এথেন্সে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। প্রায় দু'শ বছর আগে এথেন্সের অধিকারভুক্ত সমগ্র য়্যাটিকার জনসমাজ মিলিত হওয়ায় এথেন্স রাষ্ট্রপুঞ্জের আকার ধারণ করে। ফলে, আগে যে রাজতন্ত্র ছিল তার অবসান ঘটে এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থা ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণীর হাতে চলে যায়। এই সময় সমাজে শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক, কৃষক সম্প্রদায়, কারিগর এবং বণিক শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। Item 4

এথেন্সের মানুষ ছিল বিদ্যানুরাগী। ছেলেরা সাত বছর থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করত। তার পর ষোল বছরে শিখত শরীরচর্চা, আর আঠারো বছরে যুদ্ধবিদ্যা ও নাগরিকত্ব। তেইশ বছরে তাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব দান করা হতো। মেয়েরা বাড়িতে বসেই লেখাপড়া, ঘরের কাজ ও নিজেদের রুচিমত গান-বাজনা শিখতে পারত।

এথেন্সের লোকেরা গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। এইজন্য প্রবর্তিত প্রথম বিধি-বিধানের কঠোরতা তাদের পছন্দ ছিল না। এই সময় সোলন নামে

একজন সুশিক্ষিত নাগরিক নতুন আইন তৈরি করে এথেন্সে গণতন্ত্রের সূচনা করলেন। এতে অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করেও কৃষক সম্প্রদায় ও গরীব লোকদের জন্য কিছু কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হলো। কিছুদিন দেশে স্বেচ্ছাচারী শাসন-ব্যবস্থা (টির‍্যানি) চললেও কালক্রমে দেশের শাসন-ব্যবস্থা প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আগে যাদের নাগরিকত্ব লাভের অধিকার ছিল না, তারা সহজেই নাগরিক হবার অধিকার পায়। ফলে, দেশের জনশক্তি সুগঠিত ও প্রবল হয়ে উঠল।

মহান পিরিক্লিস-এর যুগে এথেন্সে গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। আগে ম্যাজিস্ট্রেটের (আর্কন) পদের জন্য বেতন ছিল না এবং প্রচুর ভূসম্পত্তির



এথেন্সের শিক্ষাজীবন

মালিক না হলে কেউ ঐ পদের প্রার্থী হতে পারত না। এই সময় ঐ ধরনের বিধি-নিষেধ উঠিয়ে দেওয়া হলো। যোগ্যতা থাকলে যে কোন শ্রেণীর নাগরিক ম্যাজিস্ট্রেট হবার অধিকার পেল এবং এই পদের জন্য বেতন ধার্য করা হলো। নির্বাচনের পরিবর্তে লটারি বা ভাগ্যপরীক্ষা পদ্ধতিতে সরকারী চাকরিতে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা চালু হলো। প্রত্যেক শ্রেণীর নাগরিক য়্যাসেম্বলির (এক্লেশিয়া) অধিবেশনে যোগদানের এবং জুরী হিসাবে কাজ করার অধিকার পেল। এই ধরনের কাজের জন্যও ভাতার বন্দোবস্ত হলো। আগে ভূসম্পত্তির মালিকেরাই দেশের নেতা হতো। এই সময় থেকে কারিগর, বণিক, চর্মকার এবং বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারীরাও যোগ্যতা অনুসারে নেতা হবার সুযোগ পেল। নাগরিকদের জন্য বিনা ব্যয়ে নাট্যাভিনয় দেখবার সুযোগ করে দেওয়া হলো। এইভাবে এথেন্সের সামাজিক জীবনে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দিল।

স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ঃ স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এরা ছিল রক্ষণশীল। এদের শিক্ষা-দীক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক নাগরিককে পটু সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলা। সাত বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেরা বাপ-মায়ের কাছে থাকত। তারপর রাষ্ট্র তাদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করত। এই সময় থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের বিদ্যালয়ে রেখে কষ্টসহিষ্ণুতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো। কুড়ি বছর বয়স হলে তারা সাবালক বলে গণ্য হতো এবং সামরিক বিভাগে যোগদান করত। স্পার্টাবাসীর ব্যক্তিগত জীবনে বিলাস-ব্যসনের কোন সুযোগ ছিল না। কারণ, তাদের জীবন ছিল রাষ্ট্রের কল্যাণে দান-করা ; ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু ছিল না। এইভাবে স্পার্টা গ্রীসে সেরা সৈন্যবাহিনী তৈরি করে একসময় দক্ষিণ গ্রীসের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব করতে পেরেছিল। স্পার্টার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী এক রকমই ছিল। তারা বাণিজ্য-বৃদ্ধির দিকে নজর না দিয়ে বিদেশীর অভিযানের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সীমান্ত প্রহরার দিকে বেশী নজর দিয়েছিল।

স্পার্টার শাসনতন্ত্রের চারটি বিভাগ ছিল—রাজা, কাউন্সিল, য়্যাসেম্বলি, ও ইফরস্। শেষেরটি ছিল স্পার্টার শাসনতন্ত্রের নিজস্ব অংগ। ইফরসরা ছিল জন-প্রতিনিধি। এরা নির্বাচনের ভেতর দিয়ে ক্ষমতায় আসত। তবে সে নির্বাচন হতো লটারি বা ভাগ্য-পরীক্ষার আকারে। স্পার্টার শাসনতন্ত্রে এটাই ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

এথেন্স বনাম স্পার্টা ঃ এথেন্সের মানুষ ছিল সমতলভূমির সন্তান। তাদের চোখের সামনে বাইরের জগৎটা ছিল অবারিত। কিন্তু স্পার্টা নগরী গড়ে উঠেছিল পাহাড়-ঘেরা গহন উপত্যকাভূমির নিম্নদেশে। স্বভাবতঃই বাইরের জগতের চিন্তা ও ভাবধারার সংগে সেখানকার মানুষের যোগাযোগ ছিল খুবই কম। এথেন্স হয়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ বাণিজ্য-নগরী। আর সমগ্র স্পার্টা হয়ে উঠেছিল সশস্ত্র সৈন্য-শিবির। এথেন্সের মানুষেরা খোলা জায়গায় বসে কবিতা আবৃত্তি করত কিংবা জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসত। কিন্তু স্পার্টার লোকেরা যুদ্ধের কলা-কৌশল শিখত, যুদ্ধ করতে ভালোবাসত এবং সেরা সৈনিক হবার জন্য হৃদয়ের অন্য সব বৃত্তিকে দমিয়ে রাখত।

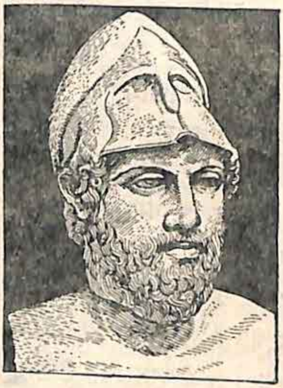
এর ফলে স্পার্টার নিরানন্দ নাগরিকেরা এথেন্সের খ্যাতি ও প্রতিপত্তিকে ঈর্ষার চোখে দেখতে লাগল। আরও অনেক নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের জ্ঞানগরিমাকে সুনজরে দেখতে পারে নি। সকলেই এথেন্স আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে লাগল। সে সুযোগ অচিরেই এসে গেল। দুটি গ্রীক নগরীর মধ্যে একটা

তুচ্ছ বিবাদকে উপলক্ষ করে চরম সংঘর্ষের সূত্রপাত হলো। স্পার্টার নেতৃত্বে এথেন্সের শত্রুশক্তি এথেন্সের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হলো। এথেন্স তার নৌশক্তি নিয়ে আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। প্রায় সমগ্র গ্রীস এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সাময়িক বিরতি সমেত এই যুদ্ধ ত্রিশ বছর ধরে চলতে থাকে। ইতিহাসে এই যুদ্ধ পেলোপোনেশীয় যুদ্ধ নামে বিখ্যাত। এথেন্সের ভয়াবহ বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে এই যুদ্ধ শেষ হয়। এথেন্স নগরী বিধ্বস্ত হয়, এথেন্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। স্পার্টাবাসীরা এথেন্সের নৌশক্তি দখল করে নেয় এবং এথেন্স স্পার্টার নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়।

সাম্রাজ্য হারাবার পর এথেন্সের গরিমা লুপ্ত হলো। কিন্তু জ্ঞান-বিদ্যাচর্চার পীঠস্থানরূপে তাদের মহিমা গ্রীসের সীমানা পেরিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

● এথেন্সের সাংস্কৃতিক মহিমা

বিশ্ব সংস্কৃতিতে এথেন্সের দান অসামান্য। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগেকার এথেন্স শুধু রাজনীতি ও বাণিজ্যেই নয়, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন, ইতিহাস ও ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। এমন সব মহামনীষী এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ইতিহাসে যাঁদের জুড়ি মেলা ভার। এথেন্সের সবচেয়ে গৌরবের যুগ ছিল পেরিক্লিসের আমলে।



মহান পেরিক্লিস

মহান পেরিক্লিস ঃ পেরিক্লিস এথেন্সের এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য শিক্ষা করেন। ফলে, তাঁর মন থেকে সমস্ত কুসংস্কার দূর হয়ে যায়। তিনি জননেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতায় এথেন্সবাসী মুগ্ধ হয়ে যেতো। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি প্রায় ত্রিশ বছর ধরে গ্রীসের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে এথেনীয় গণতন্ত্রকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দেন। তাঁরই প্রেরণায় পারসীক আক্রমণে ভস্মীভূত এথেন্স স্থপতি ও ভাস্কর ফিডিয়াসের একক চেষ্টায় নতুন রূপময়ী নগরীতে পরিণত হয়েছিল। এথেন্সের উন্নতিই ছিল পেরিক্লিসের একমাত্র চিন্তা। এই যুগ ইতিহাসে মহান পেরিক্লিসের যুগ নামে বিখ্যাত।

সাহিত্য ঃ এই যুগের সাহিত্যে এথেন্সের দান পদ্যে লেখা নাটক এবং গদ্যে লেখা ইতিহাস। প্রাচীন গ্রীসে বারুণীদেব দিওনিসাসের উৎসবে একরকম গাথা-নৃত্যের অনুষ্ঠান হতো। এটাই গ্রীক নাটকের আদিরূপ। এই গাথা-নৃত্যই রূপ বদল করে এই যুগে নাটকের আকার নিয়ে দেখা দেয়। **এসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিদিস্** এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। এঁরা সকলেই বিয়োগান্ত বা ট্র্যাজেডি নাটকের রচয়িতা ছিলেন।

সোফোক্লিস ঃ এসকাইলাসের হাতে যে বিয়োগান্ত নাটক রচনার সূচনা হয়, সোফোক্লিসের হাতে তা পূর্ণতা লাভ করে। তখন নাটক রচনা নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার পুরস্কার পেতেন। সাতাশ বছর বয়সের তরুণ নাট্যকার সোফোক্লিস এসকাইলাসকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে প্রথম পুরস্কার ছিনিয়ে নেন। পেরিক্লিস ছিলেন তাঁর বন্ধু। তিনি কিছুদিনের জন্য এথেন্সের সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি হয়েছিলেন। বর্তমানে সোফোক্লিসের সাতখানি নাটক পাওয়া যায়।



হেরোডোটাস

এথেন্সে আর এক ধরনের নাটকও লেখা হয়। তাকে বলা যায় মিলনান্ত বা কমেডি নাটক। এই ধরনের নাটকের অভিনয় দেখবার সময় মন আনন্দে ভরে যায়, মুখে হাসি ফোটে। এরিস্টোফেনিস মিলনান্ত নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

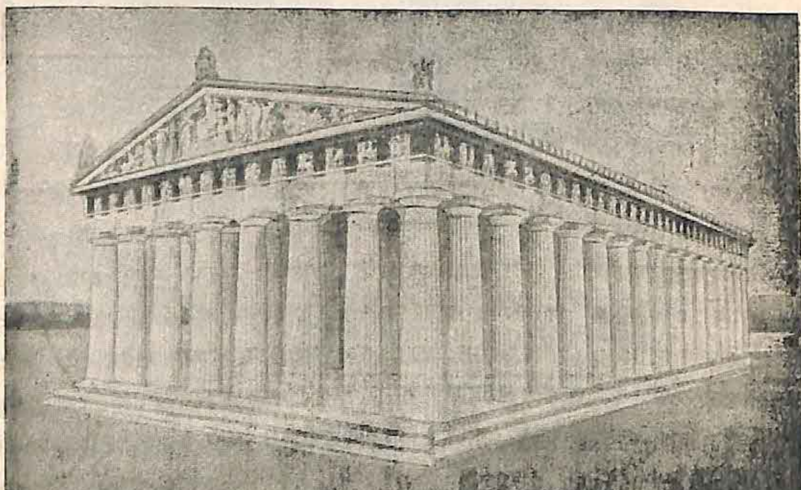
ইতিহাস রচনাকে কেন্দ্র করেই এথেন্সে গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত হয়। সে যুগের দুজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক হলেন **হেরোডোটাস** এবং **থুসিডাইডিস**। থুসিডাইডিস ছিলেন এথেন্সের মানুষ। কিন্তু হেরোডোটাস তা নন।

হেরোডোটাস ঃ হেরোডোটাসকে 'ইতিহাসের জনক' বলা হয়ে থাকে, কারণ এর আগে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে আর কারও লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় নি। হেরোডোটাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন এশিয়া মাইনরেরদ ক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে হ্যালি-কারনেসাসে। পরে তিনি দক্ষিণ ইতালীর একটি এথেনীয় উপনিবেশে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন পর্যটক। তিনি মিশর, ফিনিসিয়া, ব্যাবিলনীয়া এবং হেলেনীয় জগতের সর্বত্র ঘুরে ইতিহাস রচনার মালমসলা সংগ্রহ করেন। এথেন্সের প্রতি তাঁর অসামান্য শ্রদ্ধা ছিল। সেইজন্য গ্রীক লেখকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন।

শিল্পকলা ঃ সাহিত্যের মতো শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এই যুগে এথেন্সের দান কম নয়। তবে পেরিক্লিসের যুগে স্থাপত্য, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য এই তিনটিরই মূল লক্ষ্য ছিল দেবার্চনার জন্য মন্দির তৈরি ও তার অঙ্গসজ্জা। ফিডিয়াস হলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। এথেন্সের নগর-দুর্গে পেরিক্লিস যে-সমস্ত ইমারত তৈরি করিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে দেবী এথেনার মন্দির পার্থেনন সবচেয়ে বিখ্যাত। ফিডিয়াস ও তাঁর সঙ্গী ভাস্করেরা এই মন্দিরের গায়ে যে ভাস্কর্য শিল্পের চিহ্ন রেখে গেছেন তা অতুলনীয়!



জ্ঞানের দেবী এথেনা



দেবী এথেনার মন্দির পার্থেনন

পেরিক্লিসের যুগে তৈরী মন্দিরগুলির মধ্যে ডোরীয় এবং আয়োনিয়, উভয় রীতির স্থাপত্য কলার পরিচয় মেলে। এথেন্সে সে সময় যে সমস্ত চিত্রশিল্পী এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পলিগনটাস সবচেয়ে নামকরা। ট্রয় নগরীর লুণ্ঠন নিয়ে আঁকা এঁর একখানি ছবি বিখ্যাত।

ধর্ম ও দর্শন ঃ গ্রীকগণ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেব-দেবীরূপে পূজা করত। তারা মনে করত অলিমপাস পর্বত হচ্ছে দেবতাদের আবাসভূমি। জিউস ছিলেন দেবরাজ, তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের মালিক। য়্যাপোলো ছিলেন সূর্যদেব। তিনি আলো ও তাপ বিতরণ করেন। নাট্যকার সোফোক্লিসের ধর্মবিশ্বাসে য়্যাপোলোর স্থান ছিল খুব উঁচুতে। এথেনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী। গ্রীসে এই ধর্মচেতনা থেকেই নাটকের জন্ম হয়েছিল। দেবতাদের সম্মানের জন্য নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হতো। প্রতিটি নাগরিকই উৎসবে যোগদান করা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতো।

সক্রেটিস ঃ সক্রেটিস নিঃসন্দেহে এ যুগের সেরা মনীষী এবং জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরুদের একজন। যুক্তি-তর্কের পথে জ্ঞান ও সত্যের সন্ধান ছিল তাঁর সারা জীবনের সাধনা। তিনি প্রচলিত ধর্মচর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন না। অকাট্য যুক্তি দিয়ে তিনি সমাজের প্রচলিত ধারণাগুলির বিরোধিতা করতেন। তিনি কখনও জ্ঞানের বড়াই করতেন না, বরং বলতেন, তিনি কিছুই জানেন না। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং আলোচনার জাদুশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে এথেন্সের তরুণদল তাঁর শিষ্য হতে থাকে। এতে প্রাচীনপন্থীরা ক্ষেপে গিয়ে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ গড়ে তোলেন। এই অভিযোগে সক্রেটিসের বিচার হয়। বিচারে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। তিনি এক পেয়ালা বিষ পান করে শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তখন তাঁর বয়স সত্তর বছর। সক্রেটিস নিজে কিছু লিখে রেখে যান নি।



সক্রেটিস

ম্যাসিডন ঃ পরস্পর দ্বন্দ্বে এথেন্স ও স্পার্টা যখন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন উত্তর গ্রীসের পাহাড়ী এলাকায় ম্যাসিডন নামে একটি ছোট রাষ্ট্র ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন তখন

ফিলিপ। তিনি ছিলেন যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি চতুর। গ্রীকদের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। কিন্তু তারা অকারণ দ্বন্দ্বে শক্তি ক্ষয় করে দুর্বল হয়ে পড়ুক, এটা তিনি পছন্দ করতেন না। এইজন্য তিনি সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে সারা গ্রীসের কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিলেন। তারপরেই তিনি দিগ্বিজয়ের জন্য তৈরি হতে লাগলেন। প্রথমেই তাঁর মনে এল পারস্য অভিযানের কথা। কারণ, প্রায় দেড়শ বছর আগে পারসীকেরা গ্রীস আক্রমণ করেছিল। কিন্তু দঃখের বিষয়, সহসা গুপ্তঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হলো না।

আলেকজাণ্ডার ঃ ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁর তরুণবয়সী পুত্র আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের রাজা হলেন। পিতার অপূর্ণ কাজের ভার পুত্রের উপর বর্তাল। আলেকজাণ্ডার ছিলেন বিখ্যাত গ্রীক মনীষী এরিস্টটলের শিষ্য এবং স্বভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সিংহাসনে বসেই তিনি পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন দেখলেন। এই সময় গ্রীসের কয়েকটি রাষ্ট্রে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আলেকজাণ্ডার শক্ত হাতে রুখে দাঁড়ালেন এবং অবাধ্যতার জন্য থেব্‌স ও থিবিস রাষ্ট্র দুটিকে ধ্বংস করে ফেললেন। তারপর ইউরোপ থেকে এশিয়া মহাদেশের দিকে বিজয়াভিযানে বেরিয়ে পড়লেন।

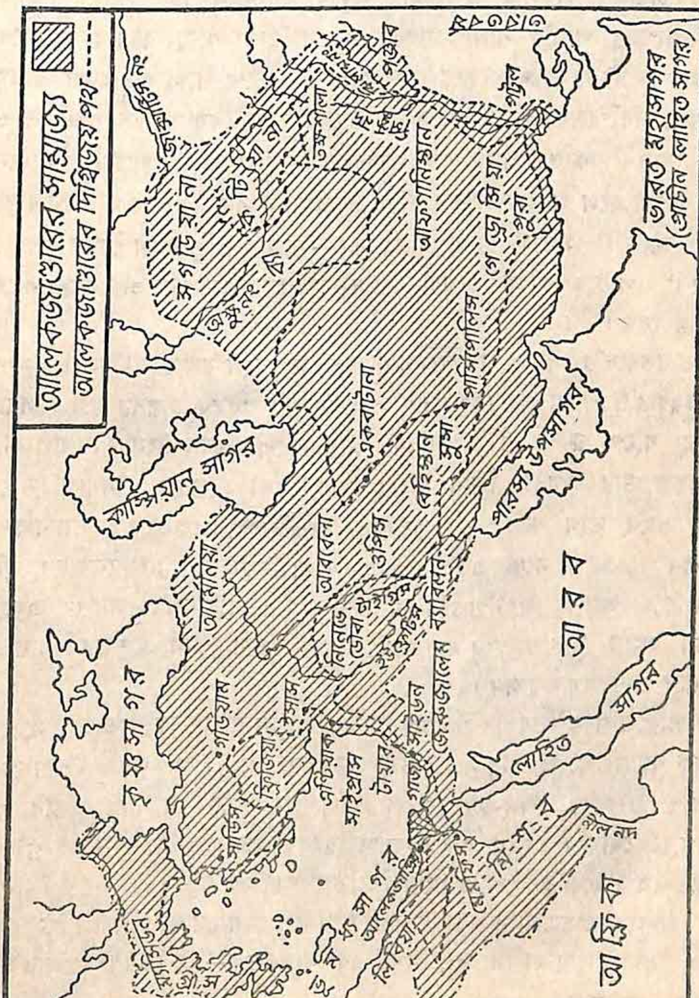


আলেকজাণ্ডার

সাত বছর পরে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে এসে পৌঁছান। এরমধ্যে তিনি ফিনিসিয়াকে ধ্বংস করেন। কারণ ফিনিসিয়া ছিল গ্রীক বণিকদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। ফিনিসিয়ার পর তিনি মিশর জয় করেন। মিশরবাসীরা তাঁকে ফ্যারাওয়ের বংশধর বলে সাদরে বরণ করে নেয়। এর পর আলেকজাণ্ডার এক বিরাট বাহিনী নিয়ে পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁর আক্রমণে সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারিয়ুস শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান ঃ পারস্যজয়ের তিন বছর পরে আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ছোট ছোট রাজ্যগুলি ছিল পারস্যের

অধীন। পারস্যের পরাজয়ের সংবাদে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু এ সব রাজ্যের মধ্যে তেমন সদ্ভাব ছিল না। আলেকজাণ্ডার তাদের দমনের জন্য ভারতে অভিযান করেন। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সামনে



অনেকেই প্রায় বিনা যুদ্ধে পরাজয় মেনে নিল। তিনি তখন নৌকার পর নৌকা সাজিয়ে সেতু তৈরি করে সিন্ধু নদ পার হলেন।

বর্তমান রাওলপিণ্ডির কাছে তক্ষশীলা নামে একটি রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজা অম্ভি প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বিনাযুদ্ধে গ্রীকবীরের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। এর পর আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে ঝিলাম নদী পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। ঝিলাম ও চেনাব নদীর মাঝখানে ছিল পুরুর রাজ্য। আলেকজাণ্ডার পুরুর রাজ্য আক্রমণ করলে রাজা পুরু বীরবিক্রমে রুখে দাঁড়ালেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে পুরু অসাধারণ বীরত্ব দেখালেও দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বন্দী হলেন। কথিত আছে, বন্দী অবস্থায় পুরুকে আলেকজাণ্ডারের সামনে নিয়ে যাওয়া হলে আলেকজাণ্ডার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কেমন ব্যবহার আশা করেন। সগর্বে পুরু উত্তর দেন—'রাজার প্রতি রাজা যেমন ব্যবহার করেন।' পুরুর বীরত্ব ও মর্যাদাবোধে মুগ্ধ হয়ে গ্রীকবীর তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেন।

ভারতবর্ষের পূর্ব অঞ্চলে মগধে তখন নন্দবংশ রাজত্ব করছিল। মগধ জয় করবার উদ্দেশ্যে আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে ক্লান্ত গ্রীক সৈন্যরা আর যুদ্ধে তেমন উৎসাহ দেখাল না। আলেকজাণ্ডার অগত্যা ফিরে যাবার জন্য তৈরী হলেন। সৈন্যবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করে তিনি তাদের তিনটি পথে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন। এদের মধ্যে একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে বেলুচিস্তানের মরুভূমি পার হয়ে অনেক কষ্টে প্রাচীন ব্যাবিলন নগরে গিয়ে পেঁছুলেন। এখানে কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি হাম্মুরাবির রাজ-প্রাসাদে প্রাণত্যাগ করলেন।

ভারতে গ্রীক অধিকার বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। একজন ভারতীয় রাজা ভারতে গ্রীকদের দখল-করা জায়গাগুলি জয় করে নিলেন। তাঁর নাম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তবে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ফলেই গ্রীস ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য ও সংস্কৃতিগত যোগাযোগ ঘটে।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক জগতে বেশ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য সিরিয়া, মিশর এবং ম্যাসিডন—এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

রোম কর্তৃক গ্রীস বিজয়ঃ এর পর এনড্রিস্কাস্ নামে এক ব্যক্তি নিজেকে পার্সিয়াসের পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে ম্যাসিডনের সিংহাসনের দাবিদার হয়ে ওঠেন। এর ফলে আবার রোমানদের সঙ্গে গ্রীকদের যুদ্ধ বেধে যায়।

এনড্রিস্‌কাস্‌ গোড়ার দিকে খানিকটা সাফল্য দেখালেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে বন্দী হন। এই চতুর্থ ম্যাসিডোনীয় যুদ্ধের ফলে ম্যাসিডন রোমের শাসনাধীন একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এর পরেও গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে আরও কিছুকাল স্বাধীনতা বজায় ছিল। কিন্তু তৃতীয় ম্যাসিডোনীয় যুদ্ধের একুশ বছর পরে যে যুদ্ধ হয়, তাতে সমগ্র গ্রীস রোমের শাসনাধীনে চলে যায়। এটা যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড়শ বছর আগেকার ঘটনা।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১. গ্রীক সভ্যতার উদ্ভবের আগে ক্রীট দ্বীপে যে সুপ্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২. ক্রীটীয় শিল্পকলার পরিচয় দিয়ে সেই সভ্যতা ধ্বংসের কারণগুলি আলোচনা করো।
৩. 'হোমারের যুগ' সম্পর্কে যা জানো তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৪. প্রাচীন গ্রীসে যে নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৫. বিভিন্ন দেশে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
৬. এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে যা জানো বলো।
৭. এথেন্স ও স্পার্টার জীবনযাত্রার পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
৮. এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে রেষারেষির কারণ কী এবং তার ফলাফল কী হয়েছিল সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
৯. এথেন্সের সাংস্কৃতিক মহিমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সেই সময়কার দুজন শ্রেষ্ঠ গ্রীক মনীষীর পরিচয় দাও।
১০. আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
১১. রোম কর্তৃক গ্রীস বিজয়ের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

মৌখিক প্রশ্ন

১. খাস গ্রীসের কাছাকাছি উদ্ভূত সভ্যতাটির নাম কি ?
২. ক্রীটের সবচেয়ে নামী শহরের নাম বলো।
৩. ক্রীটীয় শিল্পকলার সবচেয়ে বড়ো নমুনা কি ?

৪. কাদের আক্রমণে ইজিয়ান সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় ?
৫. ইজিয়ান সভ্যতার ধ্বংসের পর খাস গ্রীসে গড়ে ওঠা সভ্যতার নাম বলো।
৬. 'ইলিয়াড' ও 'অডিসী' কাব্যের রচয়িতা কে ?
৭. প্রাচীন গ্রীসে শাসন-ব্যবস্থার অংগ জনগণের সভার নাম কী ?
৮. প্রাচীন গ্রীসের একটি প্রধান নগর-রাষ্ট্রের নাম করো।
৯. ফিনিসীয়রা গ্রীকদের মতো উপনিবেশ গড়ে তুললেও তাদের প্রধান লক্ষ্য কী ছিল ?
১০. ফিনিসীয়দের বর্ণমালায় কোন্ বর্ণ ছিল না ?
১১. কোন, সময়কে এথেন্সের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয় ?
১২. এথেন্সে নতুন আইন তৈরি করে গণতন্ত্রের সূচনা করেন কে ?
১৩. কার আমলে এথেন্সে গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় ?
১৪. পেরিক্লিসের যুগে কোন্ পদ্ধতিতে সরকারী চাকুরিতে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা চালু হয় ?
১৫. স্পার্টার নাগরিকগণ কেমন স্বভাবের মানুষ ছিল ?
১৬. স্পার্টার শাসনতন্ত্রে তার নিজস্ব অংগটির নাম বলো।
১৭. এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে ত্রিশ বছর যাবৎ যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের নাম বলো।
১৮. এথেনীয় গণতন্ত্রের বিকাশে কার অবদান সবচেয়ে বেশী ছিল ?
১৯. প্রাচীন গ্রীসের একজন শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক রচয়িতার নাম বলো।
২০. পেরিক্লিসের যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর কে ? তাঁর নাম বলো।
২১. প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞানের দেবীর নাম কী ?
২২. আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় কোন্ ভারতীয় রাজা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ?
২৩. রোমের সংগে ম্যাসিডনের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের নাম কী ?

তিন

রোম

রোমের উৎপত্তি ঃ এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। গ্রীসের তখন চরম উন্নতির দিন চলেছে। সেই সময় দক্ষিণ ইউরোপের ইতালি নামে উপদ্বীপে আর একটি সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হতে থাকে। ইতালীর রোম নগরী সেই সাম্রাজ্য-শক্তির জন্মভূমি। কথিত আছে, রেমাস এবং রোমিউলাস নামে দুই ভাই ইতালীর টাইগার নদীর তীরে সাতটি পাহাড়ের কোলে এক নগরীর পত্তন করেন। রোমিউলাসের নাম অনুসারে সেই নগরীর নাম হয় রোম।

প্রাচীন রোমের শাসন-ব্যবস্থা রাজাদের হাতেই ছিল। পর পর সাতজন রাজা রোমে রাজত্ব করেন। শেষ রাজা টারকুইন ছিলেন যেমন দাম্ভিক, তেমনি অত্যাচারী। রোমের জনগণ তাঁকে সরিয়ে দিয়ে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটায়। রাজতন্ত্রের পর প্রজাতন্ত্রের পত্তন হয়। প্রজাতন্ত্রের শাসন-ব্যবস্থা জনগণের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয়। এর পর প্রায় দেড়শ' বছর যাবৎ নানা যুদ্ধ-বিগ্রহের পর রোম সারা ইতালীর সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে ওঠে।

কার্থেজের সঙ্গে রোমের সংঘর্ষ ঃ ফিনিসীয় বণিক জাতি পশ্চিম ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে কার্থেজ নামে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। কালে কালে সেই কার্থেজ বাণিজ্যের বলে ধনে জনে সমৃদ্ধ হয়ে এক প্রবল নৌ-শক্তি রূপে দেখা দেয়। নানা জায়গায় তার বাণিজ্য-বন্দর গড়ে ওঠে। বিশেষ ভাবে উত্তর আফ্রিকার বেশীর ভাগ অংশে তাদের প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া ইতালীর ঠিক দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপের বেশীর ভাগ অংশ কার্থেজবাসীরা দখল করে নেয়। ভূমধ্যসাগরের দুই তীরে রোম ও কার্থেজ তখন মুখোমুখী দু'টি রাষ্ট্র, প্রত্যেকেই নিজের প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য তৎপর। এই ভাবে কার্থেজ রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব থেকে রোম ও কার্থেজের মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয়। পর পর তিনবার এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'পিউনিক যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

প্রথম যুদ্ধে কার্থেজের সেনাপতি ছিলেন হ্যামিলকার বার্কা নামে একজন দেশপ্রেমিক। কিন্তু সে যুদ্ধে কার্থেজের ভীষণ পরাজয় হয়। তার ফলে প্রায় সমগ্র সিসিলি কার্থেজের অধিকার থেকে রোমের অধিকারে চলে যায়। কার্থেজের নৌশক্তির গর্ব খর্ব হয়। এই ভাবে রোম তার সাম্রাজ্যের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে। এই যুদ্ধে যে ক্ষ ক্ষতি হয়, তা' পূরণের জন্য হ্যামিলকার

পনের বছর ধরে যুদ্ধ চালালেন। বার্কা স্পেনের কিছু অংশ দখল করে সেখানে একটি ছোট সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্পেনের লোকবল ও অর্থবলের সাহায্যে রোমকে পাল্টা আক্রমণ করবেন। কিন্তু সহসা মৃত্যু হওয়ায় তাঁর সে আশা পূর্ণ হলো না।

প্রায় বিশ বছর একরকম শান্তিতে কেটে গেল। তারপর শুরু হলো **দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ।** এবার কার্থেজের সেনাপতি হয়ে এলেন হ্যামিলকার বার্কার পুত্র হ্যানিবল। তিনি মনে মনে রোমকে চিরশত্রু জ্ঞান করতেন। সুযোগ পেয়ে যুদ্ধবিদ্যায় পটু হ্যানিবল বিরাট হস্তীবাহিনী নিয়ে আল্পস্ পর্বত পার হয়ে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে রোমের অবস্থা সঙ্গীন করে তুললেন। যুদ্ধের শেষের দিকে ঘটনার মোড় ঘুরে গেল। এই সময় রোম বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আফ্রিকায় গিয়ে অভিযান শুরু করলেন। হ্যানিবল তখন ইতালীতে। কার্থেজবাসীরা ভয় পেয়ে তাঁকে ডেকে পাঠাল। কিন্তু সেখানে **জামার যুদ্ধে** হ্যানিবলের পরাজয় ঘটল।

এই পরাজয়ের পর কার্থেজবাসীরা আত্মসমর্পণ করল। দু'পক্ষে একটা শান্তির চুক্তি হলো। সেই চুক্তি অনুসারে একমাত্র আফ্রিকার রাজ্য ছাড়া কার্থেজের আর কিছুই রইল না। যুদ্ধজাহাজ সহ সমস্ত এলাকা রোমকে ছেড়ে দিতে হলো। হ্যানিবল পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পালিয়ে গিয়েও রেহাই পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি বিষ পান করে আত্মহত্যা করলেন।

এর পর রোম যেমন তার সাম্রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে তোলবার দিকে মন দিল। তেমনি কার্থেজও তার হারানো শ্রী কিছু পরিমাণে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগল। কার্থেজের এই উন্নতি রোম সুনজরে দেখতে পারল না। একটা তুচ্ছ অছিলা সৃষ্টি করে রোম কার্থেজকে আক্রমণ করেন। **তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধে** কার্থেজ রোমের কাছে চরমভাবে পরাজিত হল। অসংখ্য নরনারী প্রাণ হারাল। রোমানরা আগুন লাগিয়ে কার্থেজ নগর পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

কার্থেজ অধিকারের পর রোমের চেহারা একেবারে বদলে গেল। সভ্য জগতের প্রায় সমস্ত পশ্চিম অংশের সে সর্বময় প্রভু হয়ে উঠল। এইভাবে কালে কালে রোম এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হলো।

প্রাচীন রোমক সমাজ ঃ প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান ঃ প্রথম থেকেই রোমের জনসমাজ ছিল দুটি আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত—প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ান। প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীতে ছিল সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। দেশের প্রায় সব জমিগুলিই ছিল এদের হাতে। সমাজ ও রাষ্ট্রের যা কিছু সুযোগ-সুবিধা এরাই ভোগ করত। যে সমস্ত ল্যাটিন ভাষাভাষী মানুষ গোড়ার দিকে রোমে এসে বসবাস শুরু করে, প্যাট্রিসিয়ানরা ছিল তাদের বংশধর। দেশের শাসন-ব্যবস্থা ছিল

Item 4

এদের হাতে। প্যাট্রিসিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধরা **সিনেট** নামে একটি পরিষদ গঠন করত। আদিযুগে ছিল এদের উপরে একজন রাজা। কিন্তু পরে প্রজাতন্ত্র গঠিত হলে দুজন শাসনকর্তা নির্বাচিত করা হতো। তাদের **কনসাল** বলা হতো। নাগরিকদের ভোটে কনসালগণ নির্বাচিত হতো।

প্লিবিয়ানরা ছিল সাধারণ লোক। স্বাধীন কারিগর, ক্ষুদ্র কৃষক, শ্রমিক সৈন্যদের নিয়ে প্লিবিয়ান শ্রেণী গঠিত ছিল। রোমকরা নানা দেশ জয় করে সেখানকার কৃষক, কারিগরদের ভূসম্পত্তি দখল করে তাদের রোমে এসে বসবাস করতে বাধ্য করত। এরাই প্লিবিয়ান শ্রেণীতে পরিণত হয়। অধিকাংশ প্লিবিয়ান যদিও দরিদ্র ও সর্বহারার মতো, তবু তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল ধনী ব্যবসায়ী, জাহাজ-মালিক ইত্যাদি।

রোম সমাজের যত কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো প্যাট্রিসিয়ানরা। প্লিবিয়ানদের ভোটে কনসাল নির্বাচিত হলেও তারা নিজেরা কনসাল পদের প্রার্থী হতে পারত না। এমন কি অভিজাত শ্রেণীতে তাদের বিবাহ করাও নিষিদ্ধ ছিল। প্যাট্রিসিয়ান শাসকদের অত্যাচারে প্লিবিয়ানদের জীবন ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা ছিল না।

এসকল অন্যায়ের প্রতিকারে শেষ পর্যন্ত প্লিবিয়ানরা প্যাট্রিসিয়ানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়। তাদের মধ্যে এ সংঘর্ষ প্রায় দুশো বছর চলেছিল। তারপর প্লিবিয়ানদের মধ্যে থেকে একজন কনসাল নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তাদের কথা বলবার জন্য **ট্রিবিউন** নির্বাচনের অধিকার লাভ করে। এরা প্যাট্রিসিয়ানদের অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারত।

রোমের নাগরিক অধিকার ঃ ইতালীতে রোমের অনেকগুলি মিত্র রাজ্য ছিল। তারা রোমের সৈন্যবাহিনীর জন্য লোক সরবরাহ এবং বিদেশে সামরিক অভিযানের সময় নানারকম দায়-দায়িত্ব পালন করত। অথচ রোমক নাগরিকেরা যে অধিকার ভোগ করত, তা' থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। তারা সমান নাগরিকত্বের অধিকার দাবি করে বসল। এই নিয়ে ইতালীর মিত্র রাজ্যগুলির সঙ্গে রোমের মনোমালিন্য হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এই মনোমালিন্যে ইতালীতে গৃহযুদ্ধের সূচনা হল।

এই যুদ্ধ রোমের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত তারা ইতালীতে বসবাসকারী সমস্ত লোককেই নাগরিক অধিকার দিল। সমান স্বার্থের ভিত্তিতে এক সাধারণ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটল। রোম আর ইতালী একাকার হয়ে গেল।

ক্রীতদাস-প্রথা ও ক্রীতদাস-বিদ্রোহ (স্পার্টাকাস) ঃ ক্রীতদাস-প্রথা প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার এক অভিশাপ বিশেষ। অতি প্রাচীনকাল থেকেই রোমে ক্রীতদাস-

প্রথা প্রচলিত ছিল! রোম যতবার এক একটা দেশ জয় করেছে, ততবারই ইতালীতে হাজার হাজার ক্রীতদাস আমদানী করেছে। ক্রীতদাসদের জীবন ছিল একান্ত দুর্বিষহ। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত তাদের একটানা খাটতে হতো। এক মুহূর্তও তাদের বিশ্রামের সুযোগ ছিল না। এমন কি তারা পরস্পরের সঙ্গে কথাও বলতে পারত না। শস্য মাড়াই-এর সময় তাদের গলায় কাঠের কলার পরিয়ে দেওয়া হতো, যাতে একদানা শস্যও মুখে দিতে না পারে। বছরে একটা করে জামা ছিল তাদের বরাদ্দ। তাও আবার অনেক সময় কেড়ে নিয়ে কাঁথা সেলাই করা হতো। রাতের বেলায় তারা গারদে বন্দী থাকত। কাজের সময় কি ঘুমোবার সময় অনেককেই পায়ে বেড়ী দিয়ে রাখা হতো। দাসদের মনে আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেবার জন্য প্রভুরা চাবুক মেরে তাদের ক্ষতবিক্ষত করত।



রোমের ক্রীতদাস

অবাধ্য বা পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো। তাদের হিংস্র পশুর মুখে ছেড়ে দিয়ে বীভৎস আমোদ উপভোগ করতো। এইভাবে পশুর সঙ্গে যে সব ক্রীতদাস যুদ্ধ করত তাদের বলা হতো গ্লেডিয়েটার বা মল্লযোদ্ধা। আবার কখনো কখনো এদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই করানো হতো।

রোমে ও অন্যান্য অঞ্চলে দাস কেনাবেচার রীতিমত বাজার গড়ে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে রোমে অভিজাতশ্রেণীরা দাসদের দিয়েই সব কিছু উৎপাদন আরম্ভ করল। দাস-শ্রমে উৎপাদন জিনিস হতো সস্তা। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্লিবিয়ানদের তৈরি জিনিস দাঁড়াতে পারতো না। তারা অতি দ্রুত বেকার হয়ে ঋণদাসে পরিণত হতে লাগল। দেখতে দেখতে গোটা রোমই হয়ে উঠল দাসনগরী!

কিন্তু চিরকাল কাউকে ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখা যায় না। অত্যাচারিত মানুষ একদিন প্রাণভয় তুচ্ছ করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। রোমেও তাই ঘটেছিল। ৭৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সিসিলীতে প্রথম দাসবিদ্রোহ দেখা দেয়। তাদের নেতা ছিল স্পার্টাকাস নামে থেসালির এক মল্লবীর। ওরা কাপুয়ার এক কারাগার থেকে পালিয়ে এসে বিদ্রোহে যোগদান করে।

স্পার্টাকাস বিদ্রোহীদের নিয়ে বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরির নিকট মুখকে দুর্গের মতো করে লড়াই করতে লাগল। প্রায় দু'বছর ধরে তারা দক্ষিণ ইতালীতে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে রেখেছিল। জয়ের মুখোমুখি এসে হঠাৎ স্পার্টাকাস গুরুতর রূপে আহত হয়ে প্রাণ দিল। এই সময় দাসদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেল। তারপর শুরু হলো বিদ্রোহীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের পালা। প্রায় ছয় হাজার বিদ্রোহী বন্দীকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মেরে ফেলা হল।



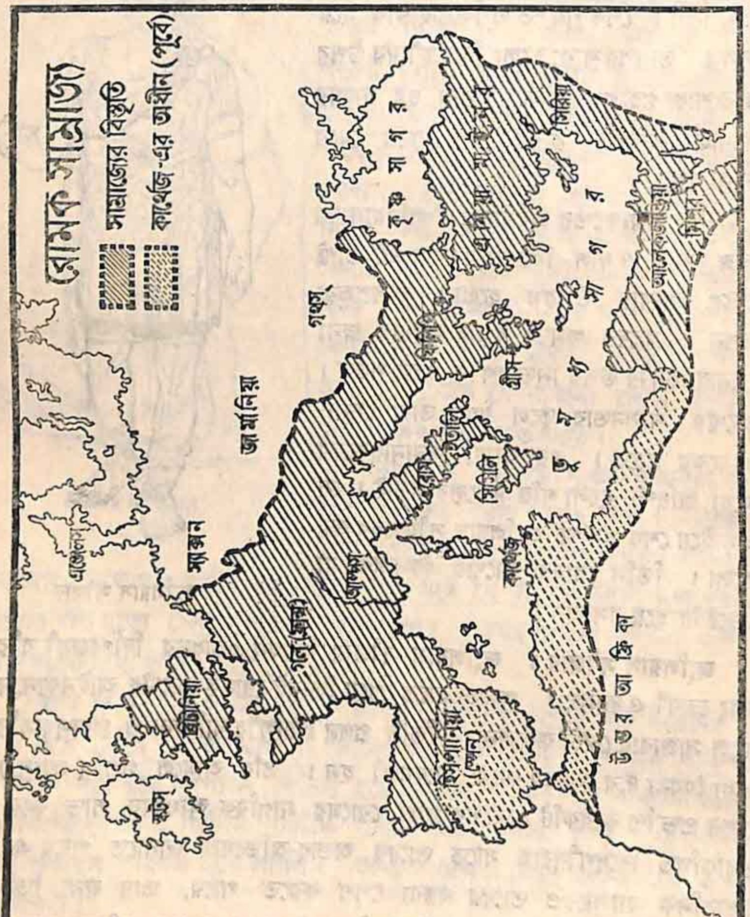
জুলিয়াস সীজার

রোমক প্রজাতন্ত্রের অবসান ঃ প্লিবিয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও দাস বিদ্রোহের ফলে এই রাষ্ট্র ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো। দাসপ্রভুরা তখন নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। রাষ্ট্রের শাসনভার তুলে দিল তারা সেনা-নায়কের হাতে। এর ফলে, সেনানায়কদের মধ্যে আরম্ভ হলো শক্তি দখলের লড়াই। সে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জুলিয়াস সীজারের জয় হলো। তিনি রোমক রাষ্ট্রের একনায়ক বা ডিক্টেটর হয়ে বসলেন।

জুলিয়াস সীজার ঃ জুলিয়াস সীজার ছিলেন একাধারে দিগ্বিজয়ী বীর এবং জ্ঞানী ও দয়ালু। ক্ষমতা হাতে পেয়ে তিনিই রোমক রাষ্ট্রের আইনকানুন ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করলেন। তিনি প্রথম ইতালীর বাসিন্দা ও প্রদেশবাসীর মধ্যে বৈষম্য দূর করবার কাজে উদ্যোগী হন। তাঁর আমলে গল (ফ্রান্স), স্পেন প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশের প্রজা রোমের নাগরিক অধিকার লাভ করে। তথাকথিত বিদেশীয়রাও যাতে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাতে পারে এবং প্রশাসনিক ব্যাপারেও তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারে, তার জন্য তিনি খানিকটা সুযোগ করে দেন। তিনি সিনেটের সদস্য-সংখ্যা বাড়িয়ে, তাতে প্রদেশের প্রতিনিধিদের স্থান করে দিলেন। সীজারের বাগ্মীয়তা, শৌর্য-বীর্য এবং নূতন নূতন সংস্কারমূলক কাজের জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল। কিন্তু দেশের কিছু ক্ষমতালোভী মানুষ তাঁর উপর খুশি ছিল না। 'প্রজাতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থার সর্বনাশ হয়ে গেল'—এই ধুয়া তুলে তারা সীজারকে সরিয়ে

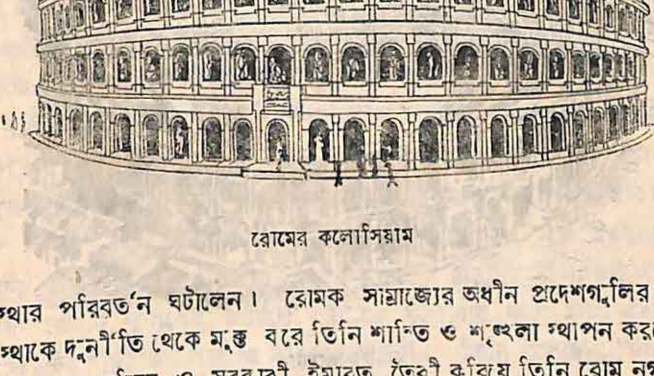
দেবার চক্রান্ত করতে লাগলো। একদিন ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারীরা সিনেটের মধ্যে সীজারকে নৃশংসভাবে হত্যা করল। এটি যীশুখ্রীষ্টের জন্মের চুয়াল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা।

সীজারের মৃত্যুর পর অ্যাণ্টনি ও অক্টেভিয়াস নামে দু'জন রোমের সিংহাসনের দাবিদার হয়ে দেখা দিলেন। শেষ পর্যন্ত রোমের সিংহাসনে



বসলেন অক্টেভিয়াস। বয়সে তরুণ হলেও তিনি ছিলেন স্বভাবে ভদ্র ও বুদ্ধিমান। কয়েক বছরের মধ্যে সিনেট তাঁকে 'অগাস্টাস' এবং জনগণ 'সীজার' বলে সম্বোধন করা শুরু করল। প্রজাতন্ত্রী রোমের অবসান ঘটে জন্ম নিল রোমক সাম্রাজ্য। অগাস্টাস সীজার হলেন রোমক সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট।

নূতন রোমক সাম্রাজ্য ঃ অগাস্টাস সীজারের আমলে রোমক সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, রাইন ও দানিয়ুব নদী, দক্ষিণে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি, পূর্বে ইউফ্রেটিস নদী এবং পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর,—এই ছিল তার সীমানা। পৃথিবীতে এত বড়ো সাম্রাজ্য হয় নি। অগাস্টাসের রাজত্বকাল নানা কারণে রোমের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। সিংহাসনে বসে তিনি নানাবিধ সংস্কারমূলক কাজে হাত দিলেন। রাষ্ট্রের আইনকানুন, দেশের সামাজিক রীতিনীতির সংস্কার ও অর্থনৈতিক



রোমের কলোসিয়াম

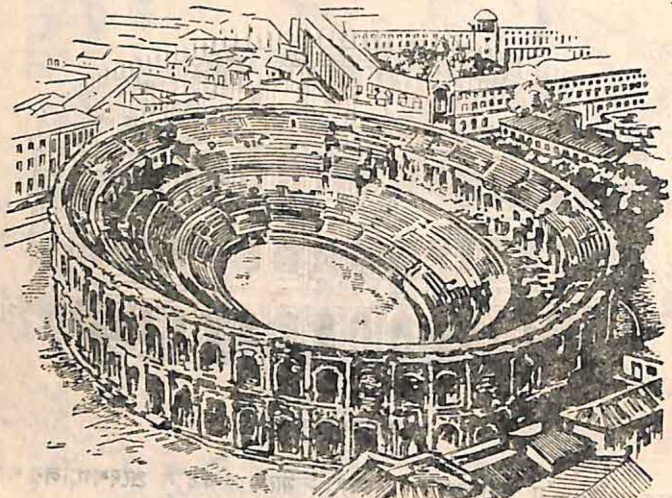
ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন। রোমক সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশগুলির শাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত করে তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন। সুন্দর সুন্দর মন্দির ও সরকারী ইমারত তৈরী করিয়ে তিনি রোম নগরীকে সুসজ্জিত করে তুললেন। তিনি গর্বের সঙ্গে বলতেন—'আমি পেয়েছিলাম ইটের তৈরি রোম, কিন্তু রেখে যাবমর্মর পাথরের তৈরি রোম।'

অগাস্টাসের রাজত্বকাল শক্তিশালী ব্যক্তি-ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। কারণ, ইতিহাসের ক্ষেত্রে **লিভি** এবং কাব্যের ক্ষেত্রে **ভার্জিল, হোরেস** ও **ভিদ** প্রমুখ প্রতিভাধর পুরুষেরা তাঁরই আমলের মানুষ। অগাস্টাসের আমলেই জুডিয়া রাজ্যের অন্তর্গত বেথেলহেম শহরে এক ইহুদি আস্তাবলে মহামানব **যীশুর** আবির্ভাব ঘটে। জুডিয়া তখন ছিল রোমের এশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটি। যীশুর বয়স যখন চৌদ্দ বছর, তখন অগাস্টাস সীজারের মৃত্যু হয়।

অগাস্টাসের পর একে একে কয়েকজন শক্তিশালী ব্যক্তি সম্রাট হন। এঁদের প্রত্যেকের রাজত্বকালেই কোন-না-কোন স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। তবে এঁদের মধ্যে এক সম্রাট ও তাঁর পুত্রের আমলের সবচেয়ে বড়ো কীর্তি হচ্ছে রোমের

কলোসিয়াম তৈরি। রোমের কলোসিয়াম পৃথিবীর প্রকাণ্ড ইমারতগুলির মধ্যে অন্যতম। এর ভিতরকার মল্লভূমি (এরেনা) দেখতে ডিম্বাকার। তার চারদিকে গ্যালারির মতো করে সাজানো আসনশ্রেণী। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ এখানে বসে মল্লযুদ্ধ দেখতে পারত।

রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেক নগরীতে বীভৎস আমোদ উপভোগের উদ্দেশ্যে অ্যাম্ফিথিয়েটার তৈরি করা হয়। এর ভেতরের বিরাট খোলা-মেলা মল্লভূমিতে



অ্যাম্ফিথিয়েটার

পশুর সঙ্গে ক্রীতদাসদের লড়াই করানো হতো। লড়াইয়ে অনেক সময় দু'পক্ষের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা মারাও যেত। নগরীর লোকেরা গ্যালারিতে বসে এই উৎকট লড়াই দেখে আনন্দ পেত।

রোমক সাম্রাজ্যের অবসান ও পতন : খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগ থেকে রোমক সাম্রাজ্যের অবসানের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। কমোডাসের আমলেই শাসন-ব্যবস্থায় নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাঁর মৃত্যুর পর সামরিক বাহিনী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সম্রাটরা হয়ে উঠলেন সৈন্যবাহিনীর হাতের পুতুল। এঁরা ছিলেন অত্যাচারী এবং রাজ্য শাসনে অপটু। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। এই সুযোগে বর্বর উপজাতির লোক গথেরা সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ শুরু করে দিল।

অবস্থা যখন চরমে উঠল তখন ক্ষমতা লাভের লড়াই গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করল। এই যুদ্ধে জয়ী হলেন কনস্ট্যানটাইন। তিনি সবাইকে হটিয়ে দিয়ে নিজে রোমক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে বসলেন। কনস্ট্যানটাইনের রাজত্বকাল দুটি কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয়—খ্রীষ্টধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম থেকে বাইজানটিয়ামে স্থানান্তর। রাজধানী হবার পর এর নাম হয় 'কনস্ট্যান্টিনোপল'। এ ছাড়া, সাম্রাজ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য শাসন-ব্যবস্থারও তিনি কিছু কিছু রদবদল করেন। এই সমস্ত কারণে তিনি ইতিহাসে **'মহান্ কনস্ট্যানটাইন'** নামে খ্যাত।

এর পরে শুরু হল রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের যুগ। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ, রাজ্যশাসনে সম্রাটদের অযোগ্যতা এবং প্রদেশগুলিতে বিশৃঙ্খলার ফলে সাম্রাজ্যের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। এমন অবস্থায় শুরু হলো বর্বর উপজাতিদের আক্রমণ। গথ, ভেন্ডাল, ফ্রাংক এবং দুর্দান্ত হূণ উপজাতির লোকেরা একের পর এক পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করল। আঘাতে আঘাতে সাম্রাজ্যের পতন ঘটল।

খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান ঃ সম্রাট অগাস্টাস সীজারের আমলে জুডিয়ায় এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম যীশু অর্থাৎ ত্রাণকর্তা। সে সময়ে সমাজে প্রচলিত ধর্মের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যীশু সত্যধর্মের মহিমা প্রচার করলেন। তাঁর প্রভাবে পুরোহিতদের প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়ায় তারা রোমান শাসনকর্তার কাছে যীশুর বিরুদ্ধে ধর্ম ও রাজদ্রোহের নালিশ জানায়। সেজন্য রোমান শাসকের আদেশে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। যীশুখ্রীষ্টের বাণী ছিল সরল ও নীতিজ্ঞানে ভরা। তিনি বলেছেন, "দরিদ্ররাই ধন্য, কেননা স্বর্গরাজ্য তাদেরই।" প্রথম দিকে গরীব, ক্রীতদাস এবং সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর মানুষেরাই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিত। কারণ, যীশুর বাণীর মধ্যে তারা আশা ও আশ্বাসের আলো দেখতে পেত।

যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যেরা যীশুর বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করে। প্রথমে রোমের লোকেরা এ ব্যাপারকে বিশেষ আমল দেয় নি। খ্রীষ্টানরা যখন সম্রাটের মূর্তিপূজার বিরোধিতা করতে লাগলো, তখন শুরু হলো খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার। তাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং তাদের সিংহের মুখে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হতে লাগলো। কিন্তু তা' সত্ত্বেও রোমক সাম্রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে ক্রমশঃ খ্রীষ্টধর্ম বিস্তার লাভ করতে লাগলো। যীশুর মৃত্যুর প্রায় তিন শ' বছর পরে কনস্ট্যানটাইন নামে একজন রোম সম্রাট খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। তখন থেকে সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যে বিনা বাধায় খ্রীষ্টধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১. রোম নগরীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলো।
২. রোমের সঙ্গে কার্থেজের সংঘর্ষের কারণ ও তার ফলাফল বিবৃত কর।
৩. দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৪. হ্যানিবল কে ছিলেন ? তাঁর সম্পর্কে যা' জানো বলো।
৫. রোমক সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে যা' জানো বুঝিয়ে বলো।
৬. প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান কাদের বলা হতো ? এই দুই শ্রেণীর মানুষদের অধিকার সম্পর্কে যা' জানো সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৭. রোমের নাগরিক অধিকার বিস্তারের কাহিনী বিবৃত করো।
৮. রোমের ক্রীতদাস প্রথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে যে ক্রীতদাস বিদ্রোহ ঘটেছিল তার বর্ণনা দাও।
৯. জুলিয়াস সীজারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতের কারণ বিবৃত করো।
১০. রোমে কেমন করে প্রজাতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে, তা' আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।
১১. রোমক সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের কারণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করো।
১২. কারণ উল্লেখ করে রোমক সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনী বর্ণনা করো।
১৩. খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের কাহিনী নিজের ভাষায় বিবৃত করো।

মৌখিক প্রশ্ন

১. রাজার ইচ্ছানুসারে যে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় তার নাম কী ?
২. প্রথম পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের সেনাপতি কে ছিলেন ?
৩. রোমক সমাজে সর্বহারা শ্রেণীর মানুষদের কী বলা হতো ?
৪. রোমে যে ক্রীতদাস-বিদ্রোহ হয়, তার নেতা কে ছিলেন ?
৫. জুলিয়াস সীজারের পর কে রোমের সিংহাসনে বসেন ?
৬. 'আমি পেয়েছিলাম ইটের রোম, রেখে যাব মর্মর পাথরের তৈরি রোম।' —একথা কে বলেছিলেন ?
৭. কোন্ সম্রাটের আমলে মহামানব যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব ঘটে ?
৮. সম্রাট ভেসপাসিয়ান ও টাইটাসের সময়ে রোমের বড়ো কীর্তি কী ?
৯. রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী হবার পর বাইজানটিয়ামের নাম কী হয় ?
১০. কার আমলে প্রকাশ্যে খ্রীষ্টধর্মের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল ?

চার

চীন

মহান স্যাঙ্ঃ প্রাচীন চীনের ইতিহাসে স্যাঙ্ বংশের রাজত্বকাল নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। স্যাঙ্ বংশের প্রতিষ্ঠাতা **চেং ট্যাং** ছিলেন যেমন দয়ালু, তেমনি প্রজাহিতৈষী। মানুষের প্রতি তো বটেই, সাধারণ জীবজন্তুর উপরও তাঁর মমতা ছিল অসীম। তিনি প্রজাদের সৎকাজের প্রশংসা করতেন। নিজের অন্যায়কেও তিনি ক্ষমা করতেন না। তিনি বলতেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করবো। দোষ যদি তোমাদের হয়, সে দোষের দায়িত্ব আমার।'

তাঁর রাজত্বকালে অনাবৃষ্টির জন্য চীন দেশে পর পর সাত বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দেশের সেই মহাদুর্যোগের দিনে সম্রাট প্রজাসাধারণের পাশে এসে দাঁড়ান। লোকে তাঁর মহৎ চরিত্রের পরিচয় পেয়ে খুশি হয়। শোনা যায়, তিনি যে সত্যিকার জন-প্রতিনিধি তা' প্রমাণ করবার জন্য একবার তিনি সাদা পোশাকে সাদা রথে চড়ে এক পাহাড়ের নিচে গিয়ে হাজির হন। তারপর নিজের দোষ-ত্রুটির কথা উচ্চারণ করে দেবতার কাছে আত্মদানের জন্য তৈরি হন। এমন সময় অবাক কান্ড ঘটে। দেবতা তাঁর ভক্তিতে খুশি হয়ে অঝোর বৃষ্টি শুরু করেন। এর ফলে দেশে আবার প্রচুর শস্য ফলে এবং দেশ আবার লক্ষ্মীশ্রীতে ভরে ওঠে। সৎ চরিত্র এবং সৎ কাজের দ্বারা তিনি এমন একটা গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে পরবর্তীকালে দেশবাসীর কাছে তিনি **মহান স্যাঙ্** রূপে পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

স্যাঙ্ বংশের শেষ সম্রাট চৌ-মিন ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তাঁর অপদার্থতার ফলেই স্যাঙ্ বংশের পতন ঘটে। স্যাঙ্ বংশ ধ্বংস করে 'উ-ওয়াং' চৌ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজত্বকালেই চীন দেশ পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়ে মহাচীনে পরিণত হয়।

কনফুসিয়াস ও তাঁর উপদেশাবলীঃ চৌ বংশের রাজত্বকালে সেই সময়কার লু (সানটাং) রাজ্যের চু ফু নগরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চীনা নাম 'কুয়াং ফু জি' অর্থাৎ মহাপ্রভু কুং। শৈশবে পিতৃহারা হয়ে তাঁর বাল্যজীবন বেশ দুঃখ-কষ্টে কাটে। বাইশ বছর বয়সে শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। নিজের বাড়িতেই তিনি শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন। তাঁর শিক্ষার তিনটি মূল বিষয় হচ্ছে—ইতিহাস, কাব্য এবং সৌজন্যতা শিক্ষার নিয়মাবলী। তিনি মনে করতেন এই তিনটি বিষয়ে সুশিক্ষা না পেলে প্রকৃত মানুষ তৈরি হয় না। তাঁর শিক্ষা ছিল মুখে মুখে, লিখে নয়।

তিনি দেশে প্রাচীনকাল থেকে চলিত নীতিবিষয়ক নিয়মগুলিকে যুগের প্রয়োজনে মার্জিত করে প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত নীতিধর্ম এই রকম ঃ চুং—নিজের ও পরের কাছে আস্থাভাজন হয়ে ওঠা ; সু—পরহিতব্রত ; জেন—মানবতা-বোধ ; ই— সত্যের প্রতি আগ্রহ ; লি—সদাচার ; চি—প্রজ্ঞা, এবং সিন—আন্তরিকতা। এই সমস্ত সৎ বৃত্তির চর্চা করে চরিত্রবান হয়ে ওঠাই ছিল কনফুসিয়াসের প্রবর্তিত নীতিধর্মের মহাশিক্ষা। এই শিক্ষায় সকল শ্রেণীর মানুষের সমান অধিকার ছিল। বাহাত্তর বছর বয়সে এই মহা-মনীষী পরলোকগমন করেন।

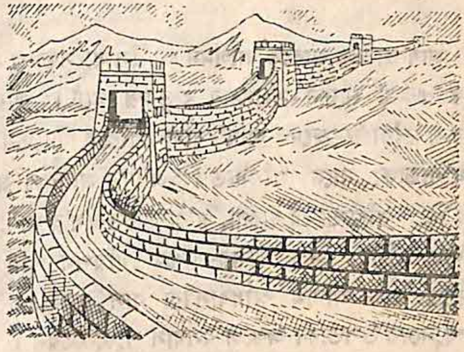

কনফুসিয়াস

মহাপ্রাচীর নির্মাণ ঃ চি'ন সাম্রাজ্য ঃ চৌ বংশের শেষ রাজা নান-ওয়াং দীর্ঘ ষাট বছর ধরে রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই রাজ্যের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল। ওদিকে পশ্চিম প্রান্তের চি'ন নামে একটি সামন্ত রাজ্য ইতিমধ্যেই বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। নান-ওয়াং-এর মৃত্যুর অল্প দিন পরেই চি'ন রাজ্যের ডিউক ওয়াং চেং একটি অখন্ড রাষ্ট্র গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন। চি'নের আক্রমণে চৌ রাজত্বের পতন ঘটে। আক্রমণ চালিয়ে চেং অনেক-গুলি ছোট ছোট রাজ্য দখলে এনে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তারপর **'সি হুয়াং তি'** (প্রথম সম্রাট) এই উপাধি ধারণ করে সমগ্র চীন দেশকে এক শাসনব্যবস্থার অধীনে আনেন। চীনের ইতিহাসে একেই রাষ্ট্রবিপ্লব বলা যেতে পারে।

চীনের মহাপ্রাচীর পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের একটি। এই প্রাচীর আড়াই হাজার মাইল লম্বা, তার মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো সুসজ্জিত তোরণ। পণ্ডিতেরা মনে করেন লক্ষ লক্ষ লোক দশ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে এই মহাপ্রাচীর তৈরি করেছিল। বিদেশী হূণদের আক্রমণ রোধ করবার উদ্দেশ্যেই এটি তৈরি হয়েছিল। প্রাচীরটি এত প্রশস্ত ছিল যে পাঁচ-ছয় জন অশ্বারোহী পূর্ণবেগে এর উপর দিয়ে ছুটতে পারতো। এই মহাপ্রাচীরের সঙ্গে সি হুয়াং তির নাম জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তিনি একা এটি তৈরি করান নি। সামন্ত যুগে যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড প্রাচীর তৈরি হয়েছিল, সি হুয়াং তি সেগুলিকে যুক্ত

করে মহাপ্রাচীর তৈরি সম্পূর্ণ করেন। এই কাজে নিযুক্ত কত লোককে যে অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মহাপ্রাচীর তৈরিকে অবলম্বন করে হ্যান যুগে একখানি অপূর্ব সুন্দর শোক-কাব্য রচিত হয়েছিল।

চি'ন বংশ মাত্র পনের বছর রাজত্ব করেছিল। হুয়াং তি-র মৃত্যুর পরেই তার পতন ঘটে। তিনি সামন্ত-শাসন উচ্ছেদ করে খণ্ড রাজ্যগুলিকে একত্রীকরণ এবং কনফুসীয় নীতিধর্মের উচ্ছেদ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে এক মহাচীন গঠন করে সেখানে বংশ-পরম্পরায় সুশাসন বজায় রাখা। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। তবু চীনের ইতিহাসের পাতায় চি'ন বংশের রাজত্বকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে আছে।



চীনেরমহাপ্রাচীর

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন

১. স্যাঙ্ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম উল্লেখ করে তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে যা' জানো লেখ।
২. কনফুসিয়াসের জীবন কাহিনী ও তাঁর ধর্মমত সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
৩. চীনের মহাপ্রাচীর কার আমলে কোন্ উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল ?
৪. চি'ন বংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে যা জানো বলো।

মৌখিক প্রশ্ন

১. স্যাঙ্ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? এই বংশের শেষ সম্রাটের নাম কী ?
২. 'ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করবো'—এ কথা কে বলতেন ?
৩. কনফুসিয়াসের শিক্ষার মূল বিষয় তিনটি কী ?
৪. চৌ বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? শেষ রাজার নাম কী ?
৫. সমগ্র চীনকে কে এক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে এনেছিলেন ?
৬. 'সি হুয়াং তি' কথাটির অর্থ কী ?

পাঁচ

ভারতবর্ষ

আর্যজাতির ভারতে আগমন ঃ সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হবার পরে ভারতবর্ষে আর একটি নূতন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। যাঁরা এই সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন, তাঁরা নিজেদের **আর্য** বলে পরিচয় দিতেন। এই জন্য এই সভ্যতা **আর্য-সভ্যতা** নামে পরিচিত। এঁদের আদি পরিচয় এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি। পণ্ডিতদের ধারণা, এঁরা ভারতবর্ষের মানুষ নন। আর্যরা মধ্য অথবা পশ্চিম এশিয়া থেকে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ পার হয়ে ভারতে এসেছিলেন। ভারতে তখন আদিম অধিবাসীরা বাস করত। আর্যরা তাদের হটিয়ে দিয়ে সিন্ধুনদের উপত্যকা অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তারপর তাঁরা ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের বেশীর ভাগ জায়গা দখল করে সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম রাখেন **আর্যাবর্ত**।

ঠিক কোন্ কারণে এবং কোন্ সময়ে আর্যরা পিতৃভূমি ত্যাগ করে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েন, তা' বলা কঠিন। তবে অনেকের মতে প্রায় চার হাজার বছর আগে আর্যদের একটি শাখা ভারতবর্ষে আসে। অন্যান্য কয়েকটি শাখা ইরান, গ্রীস এবং ইউরোপের নানা জায়গায় বসতি স্থাপন করে। কিছুকাল আগে এশিয়া মাইনরের বোখাজ-কোই নামে এক জায়গা থেকে একটি লিপি পাওয়া গেছে। তাতে বৈদিক দেব-দেবীর উল্লেখ আছে। এই লিপি দেখে অনুমান করা হয়, খ্রীষ্টপূর্ব চৌদ্দ শ' বছর আগে আর্যরা ঐ অঞ্চলে বাস করতেন অথবা ঐ অঞ্চলের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এঁরা একসঙ্গে আসেননি, অনেক দিন ধরে বিভিন্ন দলে ভারতবর্ষে আসেন।

বসতিবিস্তার ঃ আর্যরা প্রথমে পাঞ্জাবে এসে সিন্ধুনদের সাতটি উপনদীর তীরবর্তী উর্বর অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। সাতটি নদীর দেশ বলে বৈদিক সাহিত্যে এই অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে **সপ্ত সিন্ধু**। সেখানে বসবাসের সময় তাঁরা মুখে মুখে চারটি বেদ রচনা করেন।

চারি বেদ ঃ আর্যদের প্রাচীন কীর্তি **বেদ**। বেদ শব্দটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। বেদ চারখানি—**ঋক্, সাম, যজুঃ** এবং **অথর্ব**। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো হলো ঋক্ বেদ। এটি যেমন একদিকে আর্যদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ এবং অন্য দিকে তেমনি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ। হিন্দুদের বিশ্বাস, বেদে যে সমস্ত মন্ত্র আছে, তা' কোন মানুষের রচনা নয়। সেইজন্য বেদকে **অপৌরুষেয়** বলা হয়। শিষ্যরা গুরুর কাছ থেকে মন্ত্রগুলি শুনে মুখস্থ করে

রাখত। সেইজন্য বেদের আর এক নাম **শ্রুতি**। আর্যদের সমস্ত জ্ঞান ও চিন্তার মূল উৎস হচ্ছে বেদ। ঋক্‌বেদে অগ্নি, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি তেত্রিশ জন দেবতার উদ্দেশে রচিত হাজারের বেশী স্তোত্র বা মন্ত্র আছে। সামবেদের স্তোত্রগুলির বেশীর ভাগ ঋগ্‌বেদ থেকে নেওয়া। যজ্ঞের সময় এইগুলি গান করা হতো। যজুর্বেদে যাগযজ্ঞের বিধি-বিধান ও মন্ত্রাদি আছে। আর অথর্ববেদে রয়েছে ভূত-প্রেতের মন্ত্র এবং নানা প্রকার রোগের ওষুধপত্র, মাদুলি-কবচ প্রভৃতি নেবার নিয়মকানুন থেকে শুরু করে সুন্দর সব স্তোত্র।

প্রত্যেক বেদের দু'টি করে ভাগ আছে—**সংহিতা** এবং **ব্রাহ্মণ**। সংহিতা পদ্যে এবং ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত। সংহিতায় আছে গাথা ও মন্ত্র আর ব্রাহ্মণে আছে যাগযজ্ঞের বিধি নির্দেশ। বেদের পর ভারতীয় আর্য ঋষিরা **আরণ্যক** ও **উপনিষদ্** রচনা করেন। উপনিষদ্ সূক্ষ্ম তত্ত্ব-চিন্তার খনি বিশেষ। উপনিষদ্ থেকেই ভারতীয় দর্শনের সূত্রপাত হয়।

প্রাচীন আর্য সমাজ ঃ বেদ থেকে আর্যদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা, তাঁদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অনেক খবর জানতে পারা যায়। আর্যদের সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। পিতা ছিলেন পরিবারের কর্তা। পরিবারের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব যেমন ছিল অসীম, তেমনি পরিবারের রক্ষার দায়িত্বও ছিল তাঁর। সমাজে মহিলাদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। মাতা ছিলেন গৃহকর্মের কর্ত্রী। মেয়েদের সযত্নে লালন করা হতো। তাঁরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে সংহিতার স্তবও রচনা করেছেন। **বিশ্ববরা, ঘোষা, অপলা ও মমতা** এঁরা মহিলা হলেও বেদমন্ত্রের ঋষি ছিলেন। ঋগ্বেদের যুগে আর্য সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না। মেয়েরা উৎসব ও সভা-সমিতিতে যোগ দিত।

আর্যরা সুতী, পশম ও পশুর চামড়ায় পরিচ্ছদ পরতেন। ধনীদের পোশাক-পরিচ্ছদে অনেক সময় সোনার কাজ করা থাকত। উৎসবের সময় তাঁরা মূল্যবান অলংকার পরতেন।

আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল দুধ, ঘি, ফল, যব আর গম। যজ্ঞের সময় তাঁরা সোমরস পান করতেন। তাঁদের নানা আমোদ-প্রমোদ ছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিল মৃগয়া, মাছ ধরা, ঘোড়দৌড়, রথ চালনা ও নৃত্যগীত।

আর্যরা আদিম অধিবাসীদের সুনজরে দেখতেন না। তারা ছিল আর্যদের কাছে 'দস্যু' বা 'দাস'। আর্য-সমাজে জাতিভেদ ছিল না। আর্য ও শূদ্রের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক ছিল। কালে কালে যোগ্যতা ও কাজের ভিত্তিতে সমাজের চারিটি বর্ণের সৃষ্টি হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। শাস্ত্রপাঠ এবং যাগযজ্ঞের ভার ছিল ব্রাহ্মণদের উপর, তাঁরা বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতেন। ক্ষত্রিয়েরা ছিল

Item 4

যোদ্ধা। তারা দেশরক্ষা করত। বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুপালন এবং কৃষিকাজের দেখাশোনা করত। সমাজের নিচুতলায় ছিল অনার্য শূদ্ররা। তারা অন্য তিন বর্ণের মানুষদের সেবার কাজ করত। এই ভাবে আর্যসমাজে বর্ণভেদকে ভিত্তি করে জাতিভেদের উদ্ভব হয়।

ধর্মচর্চা ঃ গোড়ার দিকে আর্যদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তেমন জাঁকজমক ছিল না। প্রকৃতির নানা রূপ ও শক্তিকে তাঁরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন। আকাশের দেবতা দ্যোঃ, জলের দেবতা বরুণ, বৃষ্টির দেবতা পর্জণ্য, বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, বায়ুর দেবতা মরুৎ, আলোর দেবতা মিত্র বা সূর্য, তেজের দেবতা অগ্নি ছিলেন দেবতাদের প্রধান। পুরুষ দেবতার তুলনায় নারী দেবতাদের স্থান ছিল নীচে। দেবীদের মধ্যে সরস্বতী, ঊষা ও পৃথিবীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে মূর্তিপূজার চল ছিল না। আর্যরা বহু দেবদেবীর আরাধনা করলেও তাঁদের বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর এক। নানা দেবদেবীর মধ্যে তাঁরই প্রকাশ। উপনিষদের যুগে এসে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়।

যজ্ঞ ছিল আর্যদের ধর্মচর্চার প্রধান অঙ্গ। যজ্ঞের সময় আগুন জ্বালিয়ে মন্ত্রপাঠ, হোম এবং সামগান করা হতো। যজ্ঞে ঘি, দুধ, শস্য, মাংস, সোমরস নামে মাদক পানীয় আহুতি দেওয়া হতো। যজ্ঞের সময় পশুবধেরও নিয়ম ছিল। এই যজ্ঞের প্রয়োজনে পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। কালে কালে বৈদিক দেবতাদের পাশাপাশি রুদ্র, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা লোক-সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

আর্যদের রাজনৈতিক সংগঠন ঃ বৈদিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারে পুরুষরাই ছিলেন কর্তা। তাঁদের বলা হতো **গৃহপতি**। কতকগুলি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠত গ্রাম। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি **বিশ** বা **জন** গড়া হতো। গ্রামের কর্তাকে **গ্রামণী** এবং বিশের কর্তাকে **বিশপতি** বলা হতো। বিশপতির আর এক পরিচয় ছিল—**রাজন্‌** বা রাজা। তিনিই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন।

গোড়ার দিকে রাজার ক্ষমতা খুব বেশী ছিল না। জ্ঞানীগুণী লোকদের নিয়ে গঠিত **'সভা'** এবং জনসাধারণকে নিয়ে তৈরি 'সমিতির' সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে কাজ করতে হতো। অন্যায়ের বিচার, চোর-ডাকাতদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করা, যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া—এইগুলি ছিল রাজার কর্তব্য। পরে অবশ্য রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কোন কোন রাজা **সম্রাট, একরাট** প্রভৃতি উপাধি ধারণ করতেন। রাজসূয় কিংবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দিতেন। ক্ষত্রিয়রাই সাধারণতঃ রাজা হতেন। সমাজে প্রায় রাজার

সমান মর্যাদা পেতেন পুরোহিতরা। এঁরা রাজার কল্যাণ কামনা করে দেবতাদের পূজা করতেন। রাজারাও রাজকার্যে পুরোহিতদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারী ছিলেন সেনানী বা সেনাপতি এবং গ্রামণী। সেনাবাহিনীতে পদাতিক, অশ্বারোহী ও রথারোহী সৈন্য থাকত। যুদ্ধে রথ, তীর-ধনুক, কুড়ুল, গদা, তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি ব্যবহার করা হতো।

বেদে 'গণ' শব্দটির উল্লেখ দেখে মনে হয়, ঐ সময় দেশের কোথাও কোথাও গণতন্ত্র চালু ছিল। গণতন্ত্রগুলিতে রাজা থাকতেন না। জনগণ সেগুলি পরিচালনা করত।

● মহাকাব্যযুগল

বৈদিক যুগের শেষ দিকে **রামায়ণ** ও **মহাভারত** নামে দু'খানি মহাকাব্য রচিত হয়। **মহাকবি বাল্মীকি** এবং **মহর্ষি ব্যাসদেব** যথাক্রমে এই গ্রন্থ দু'খানির রচয়িতা হিসাবে পরিচিত। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে প্রাচীন ভারতের অনেক কথা জানা যায়। এই দু'খানি মহাকাব্য ভারতবর্ষে চিরকালের ইতিহাস। গোড়ার দিকে গ্রন্থ দু'খানির কাহিনী গাথার আকারে লোকমুখে প্রচারিত ছিল। পরে সেগুলি একত্রে গাঁথা হয়ে মহাকাব্যের রূপ ধারণ করে।

রামায়ণ ঃ রামায়ণকে আদি কাব্য বলা হয়। রামায়ণ যুগে যুগে ভারতবাসীর চিন্তায় ও আচরণে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রতিদিন গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে তা পঠিত হচ্ছে—দরিদ্রের পর্ণকুটির হতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তার সমাদর। সীতাহরণ এবং রাম-রাবণের যুদ্ধ রামায়ণ কাহিনীর মূল অংশ। কিন্তু এর জন্যই রামায়ণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। রামায়ণে একান্নবর্তী পরিবারের এমন সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে যা' যুগে যুগে ভারতবাসীকে আদর্শ পরিবার-জীবনের প্রেরণা জুগিয়েছে।

রামায়ণ থেকে সেকালের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনেক কথা জানা যায়। সেকালে দেশে ক্ষত্রিয়দেরই ক্ষমতা ছিল বেশী। তারাই দেশ শাসন করত। বংশপরম্পরায় রাজপদ লাভ করা যেত। প্রজার হিত করাই ছিল রাজার বড়ো কর্তব্য। রামচন্দ্র ছিলেন আদর্শ প্রজাপালক রাজা।

মহাভারত ঃ রামায়ণের মতো মহাভারতেরও মূল কাহিনী হচ্ছে কুরুক্ষেত্রে কৌরব-পাণ্ডবদের যুদ্ধ। মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতের রচয়িতা হিসাবে খ্যাত। মহাভারত অষ্টাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মহাভারতে যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনীর সঙ্গে সমাজনীতি, ধর্মনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির অনেক কথা আলোচিত হয়েছে। মহাভারতের কালে জাতিভেদ-প্রথা ক্রমশঃ কঠোর হয়ে ওঠে। সে সময়ে সমাজ ছিল কৃষিভিত্তিক। কৃষিই ছিল বেশীর ভাগ মানুষের জীবিকা। তবে শিকার,

পশুপালন করেও অনেকে জীবন ধারণ করত। ব্যবসা-বাণিজ্যও আগের চেয়ে বেড়ে যায়। পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং নারীজাতির প্রতি সম্মান সেকালের সমাজ-জীবনের এক বড়ো অঙ্গ ছিল।

● জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়

বৈদিক ধর্ম কালে কালে তার সরলতা হারিয়ে ফেলে। নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠান এবং যাগযজ্ঞ জটিল ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। নিম্নবর্ণের অসংখ্য মানুষের কাছে তা অত্যাচারের সামিল হয়ে ওঠে। সেই সময় ধর্ম সাধনায় নূতন পথের দিশারী হয়ে আবির্ভূত হন **মহাবীর** ও **গৌতম বুদ্ধ**। এঁরা দুজনেই ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান। এঁরা যথাক্রমে **জৈন** এবং **বৌদ্ধ ধর্ম** পত্তন করেন। এই ধর্মমতের পত্তন ও প্রচারকে ধর্মবিপ্লব বলা যেতে পারে।



মহাবীর

জৈনধর্মঃ জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতার নাম বর্ধমান মহাবীর। মহাবীর 'জিন'-এর নামানুসারেই এই ধর্মমতের নাম হয় **জৈন**। জিন্ কথাটির অর্থ 'জয়ী'। মহাবীর অজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়কে জয় করে 'জিন' উপাধি লাভ করেন। তবে তাঁর আগে থেকেই এই ধর্মমত প্রচলিত ছিল। **পার্শ্বনাথ** বা **পরেশনাথ** মহাবীর এবং আরও কয়েকজন ধর্মগুরু এই ধর্মমত প্রচার করেন। জৈন ধর্মগুরুরা **তীর্থঙ্কর** নামে পরিচিত। মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর অর্থাৎ পথপ্রদর্শক।

বিহারের বৈশালী নগরের (বর্তমানে মজঃফরপুর) কাছাকাছি কুন্দপুর বা কুণ্ড গ্রামে এক ক্ষত্রিয় বংশে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ, মায়ের নাম ত্রিশলা। সংসার জীবনে তাঁর নাম ছিল বর্ধমান। ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সংসারে বাস করেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি

সন্ন্যাস নিয়ে পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে এক গ্রামে বারো বছর ধরে কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করেন। তখন থেকে তাঁর নাম হয় 'মহাবীর জিন'। বাহাত্তর বছর বয়সে পাটনার কাছে পাবা নামে এক গ্রামে তাঁর তিরোধান ঘটে।

ধর্মচর্চার জন্য মহাবীর **পঞ্চযাম** বা পাঁচটি নীতি প্রচার করেন। সে নীতিগুলি হচ্ছে—অহিংসা, অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা কথা না বলা, অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা, অপরিগ্রহ অর্থাৎ কেউ স্বেচ্ছায় দান না করলে কোন জিনিস গ্রহণ না করা এবং ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ সংযমের সাহায্যে ইন্দ্রিয় জয় করা। জৈন মতে জগতে সমস্ত কিছুই প্রাণময়। সুতরাং সবক্ষেত্রেই অহিংসা পালন করা উচিত।



গৌতম বুদ্ধ

মহাবীর নিজে মগধ, অঙ্গ, মিথিলা এবং কৌশলে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে দু'শ' বছরের মধ্যে জৈনধর্ম দক্ষিণ ভারত ও অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। জৈন ধর্মগ্রন্থের চারটি ভাগ—অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র। জৈনদের ধর্মগ্রন্থ অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষায় লেখা।

বৌদ্ধধর্ম : জৈনধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মেরও জন্ম হয় জটিল বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিবাদে। এই ধর্মমত প্রচার করেন **গৌতম বুদ্ধ** এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হয় **বৌদ্ধধর্ম**। নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নগরের কাছে লুম্বিনীতে গৌতমের জন্ম হয়। তাঁর আর এক নাম ছিল **সিদ্ধার্থ**। গৌতমের পিতা **শুদ্ধোদন** ছিলেন শাক্যরাজ্যের নেতা। মায়ের নাম **মায়াদেবী**। অল্প বয়সেই জরা, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী দেখে সিদ্ধার্থের মন বিচলিত হয়ে উঠে।

পুত্রের এরূপ উদাসীন ভাব দেখে পিতা শুদ্ধোদন অল্প বয়সেই গোপা বা যশোধরা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। গৌতমের বয়স যখন উনত্রিশ তখন তাঁদের রাহুল নামে একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। কিন্তু সংসার

তাঁকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারল না। তিনি স্ত্রীপুত্রের মায়া কাটিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে বেরিয়ে পড়লেন। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি শেষে গয়ার কাছে **উরুবিল্ব** নামে এক জায়গায় আসেন। সেখানে গিয়ে এক অশ্বত্থ গাছের নীচে গভীর তপস্যা শুরু করেন। একটানা ছয় বছর ধরে তপস্যা করে তিনি **'বোধি'** অর্থাৎ **দিব্যজ্ঞান** লাভ করলেন। বোধি লাভের পর থেকে তাঁর নাম হলো **বুদ্ধ**। যে জায়গায় তিনি তপস্যা করেছিলেন সেই জায়গা **বুদ্ধগয়া** এবং যে গাছের নীচে বসে বোধি লাভ করেন সেই গাছ **বোধিদ্রুম** নামে বিখ্যাত হয়। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি কাশী, কোশল, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করেন। আশী বছর বয়সে প্রাচীন কুশীনগরে তিনি দেহ রাখেন।

বুদ্ধের বাণী ছিল খুব সহজ ও সরল। তিনি যাগযজ্ঞে এবং জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন না। বুদ্ধদেব কর্মফল ও পুনর্জন্মের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য নির্বাণ লাভকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করতেন। নির্বাণ লাভের জন্য তিনি **অষ্টমার্গ** বা আটটি পথের কথা বলে গেছেন। সেই আটটি পথ হলো—সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ সঙ্কল্প, সৎ জীবন, সৎ চেষ্টা, সৎ স্মৃতি, সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সমাধি। এই পথে চলতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন অহিংসা। অহিংসাই এই ধর্মের মূল ভিত্তি এবং 'সংঘ' হল প্রধান অঙ্গ।

বুদ্ধদেবের তিরোভাবের (মহাপরিনির্বাণ) পর তাঁর শিষ্যরা রাজগৃহে এক মহাসম্মেলনে মিলিত হয়ে বুদ্ধের উপদেশ সমূহ তিনটি বইয়ে সঙ্কলন করেন। তার নাম হয় **ত্রিপিটক**। ত্রিপিটক বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ। কালে কালে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের সীমানা পার হয়ে চীন, তিব্বত, সিংহল, ইন্দোচীন এবং মধ্য এশিয়ার নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

● ভারতে সাম্রাজ্য শক্তির অভ্যুত্থান

প্রাচীনকালে সারা ভারতবর্ষ এক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে ছিল না। মহাবীর এবং বুদ্ধদেবের সমকালে ভারতবর্ষে ষোলটি মহাজনপদ বা রাজ্য ছিল বলে জানা যায়। এই রাজ্যগুলিতে **রাজতন্ত্র** অথবা **গণতন্ত্র** চালু ছিল। কালে কালে গণতন্ত্রগুলিকে গ্রাস করে রাজতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তে চারটি রাজ্য এই ভাবে শক্তিশালী হয়ে পড়ে—অবন্তী, বৎস, কোশল এবং মগধ। এদের মধ্যে মগধ সবচেয়ে প্রধান হয় এবং মগধকে কেন্দ্র করেই মৌর্যযুগে ভারতবর্ষে প্রথম সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে এই রাজ্যের সীমা দক্ষিণ বিহারের পাটনা ও গয়া জেলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

মৌর্য বংশের আগে হর্যঙ্ক, **শিশুনাগ** এবং **নন্দবংশ** নামে তিন রাজবংশের রাজারা মগধে রাজত্ব করেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়

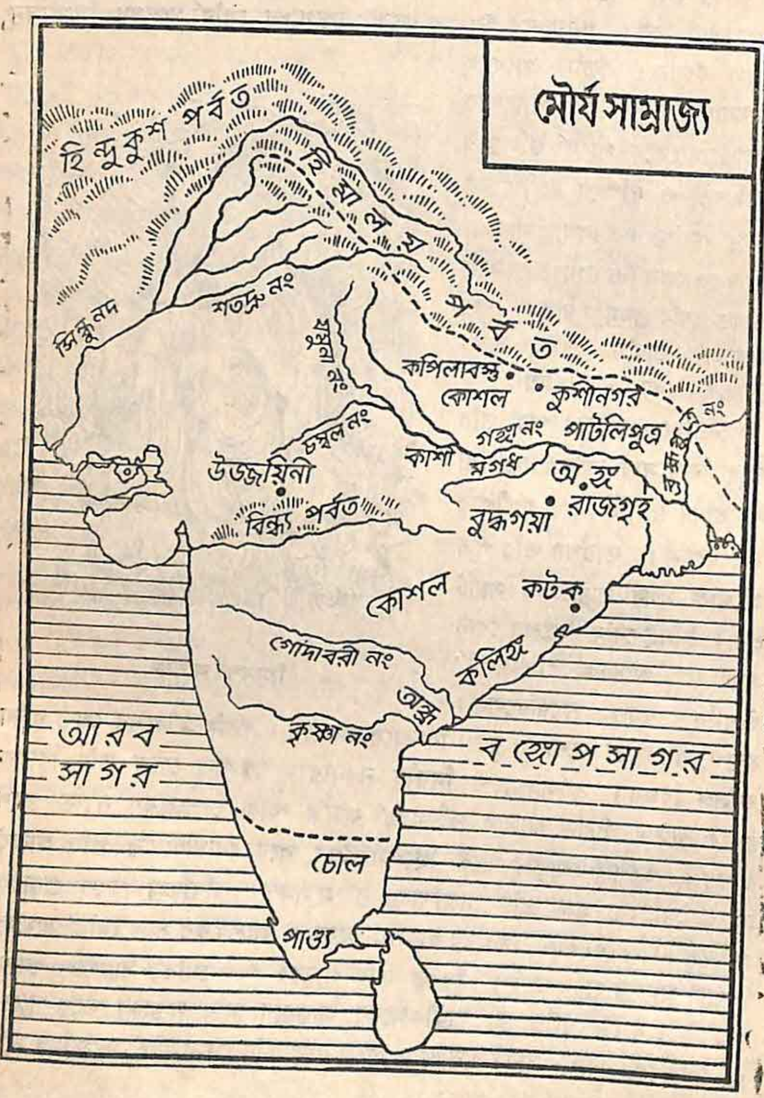
নন্দবংশের শেষ রাজা **ধননন্দ** ছিলেন মগধের রাজা। তাঁর সৈন্যবল ও তাদের বীরত্বের কথা শুনে আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ী বাহিনী আর অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। ধননন্দকে উৎখাত করেই **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য** মগধের সিংহাসন দখল করেন। তিনি পশ্চিমে আফগানিস্থান ও পারস্যের মালভূমি থেকে পূর্বে কলিঙ্গের সীমান্ত ও দক্ষিণে মহীশূরের উত্তর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট। তাঁর আমলেই ভারতে প্রথম রাজনৈতিক ঐক্যের সূচনা হয়।



প্রিয়দর্শী অশোক

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **বিন্দুসার** 'অমিত্রঘাত' বা শত্রুহন্তা উপাধি নিয়ে মহীশূর জয় করেন। তারপর তাঁর পুত্র অশোক মগধ সাম্রাজ্যের সম্রাট হন। ইনিই মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। অশোক 'প্রিয়দর্শী' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের মতো অশোকও রাজ্য বিস্তারে মন দেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা **কলিঙ্গ বিজয়**। কলিঙ্গযুদ্ধে নিরীহ নরনারীর রক্তপাত দেখে তাঁর বিবেক জেগে ওঠে। তিনি অস্ত্রের পরিবর্তে ধর্মের দ্বারা দেশজয়ের নীতি গ্রহণ করেন। অশোক গোড়ার দিকে ছিলেন শৈব, পরে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। অহিংসা হয় তাঁর রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র। বিভিন্ন দেশে প্রচারক পাঠিয়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অশোকের সময় মৌর্য সাম্রাজ্য বিশাল আকার ধারণ করে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। ব্যাকট্রীয় গ্রীক বা বাট্রীকগণের আক্রমণে মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। এই সময় শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ মগধে সুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

এর পর একে একে শক, পহ্লব এবং কুষাণগণ ভারত আক্রমণ করে। এই সমস্ত বিদেশী জাতির মধ্যে **কুষাণগণ** ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ভারতের বাইরের কিছু অংশও কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কুষাণ সম্রাটদের


মৌর্যসাম্রাজ্য
হিন্দুকুশ পর্বত
হিমালয় পর্বত
সিন্ধুনদ
শতদ্রু নং
যমুনা নং
কপিলাবস্তু
কোশল
কুশীনগর
গঙ্গা নং
পাটলিপুত্র
ব্রহ্মপুত্র নং
চম্বল নং
উজ্জয়িনী
কাশী
মগধ
অঙ্গ
রাজগৃহ
বুদ্ধগয়া
বিন্ধ্য পর্বত
কোশল
কটক
গোদাবরী নং
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
কৃষ্ণা নং
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
চোল
পাণ্ড্য

মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **প্রথম** কণিষ্ক। তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট। তাঁর আমলে সাম্রাজ্যের সীমানা কাবুলের উপত্যকা হতে বারানসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।



কণিষ্ক

কণিষ্কের মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর উত্তর ভারতে কোন শক্তিশালী রাজা ছিল না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাটলিপুত্রকে কেন্দ্র করে আবার এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। এই সাম্রাজ্যই ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিখ্যাত গুপ্ত সাম্রাজ্য। গুপ্ত বংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি সম্রাটগণ বিদেশী শক রাজবংশের লোকদের বিতাড়িত ক'রে, ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। গুপ্ত-বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন **সমুদ্রগুপ্ত**। তাঁর আমলেই গুপ্ত সাম্রাজ্য সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে। ভারতে যথার্থ রাজনৈতিক ঐক্যের পত্তন হয়। স্কন্দ-গুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। বাইরের দুর্ধর্ষ হূণদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়। পঞ্জাব থেকে মধ্যভারত পর্যন্ত হূণদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের সামন্তরাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।



বীণা বাদক সমুদ্র গুপ্ত

● প্রাচীন বঙ্গদেশ

জনপদ ঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মতো বাংলা বা বঙ্গদেশও একটি প্রাচীন দেশ। ঐতরেয় আরণ্যক, বৌধায়ন ধর্মসূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালে **বঙ্গ** বলতে সারা বঙ্গদেশকে না বুঝিয়ে অংশবিশেষকে বোঝাত। কারণ, সারা

বঙ্গদেশ এক রাজার অধীনে ছিল না। দেশ ছিল নানা স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত। এদের বলত **জনপদ**। উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত, এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, বঙ্গাল প্রভৃতি জনপদ ছিল। এ ছাড়া উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশের নাম ছিল গৌড়। ক্রমে ক্রমে এই জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে গৌড় প্রধান ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালে বাংলার সীমানা ছিল অনির্দিষ্ট। রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে বারংবার বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার রদবদল হয়েছে।

কৌম সমাজের শাসন ঃ প্রাচীন বঙ্গদেশে খণ্ড জাতিদের **কৌম সমাজ** দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করত। পঞ্চায়েতী প্রথা, চাষের জমি বিলি-বন্দোবস্ত ও সামাজিক অপরাধের শাস্তিদান প্রভৃতির মধ্যে আজও কৌম শাসন-ব্যবস্থার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। কালে কৌম শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আগেকার চতুর্থ শতকে **গঙ্গারাষ্ট্র** নামে এক স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীন বাংলার গ্রাম, সমাজ ও শিল্পকলা ঃ প্রাচীন বঙ্গদেশের সমাজের ভিত্তি ছিল গ্রাম এবং বাঙ্গালীর প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। তবে শিল্প ও বাণিজ্যেও তাদের কৃতিত্ব কম ছিল না। মাটির পাত্র, কাঠ, সোনা-রূপো ও হাতীর দাঁতের কাজ এবং বয়নশিল্পে বাঙ্গালীর খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার মসলিনের আদর ছিল জগৎজোড়া। তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে বাঙ্গালীর বাণিজ্যপোত নানা জিনিস নিয়ে দূরদেশে যেত।

পোড়ামাটির শিল্পে (টেরাকোটা) বাঙ্গালী যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। **পাহাড়পুর, চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক** প্রভৃতি জায়গায় সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির মূর্তি ও ফলক পাওয়া গেছে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে বাংলা ঃ গুপ্ত যুগেই বাংলাদেশের মাটিতে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল বিস্তার করে। তখন বাংলার আদিম সংস্কৃতি কোণ-ঠাসা হয়ে পড়ে। বাংলার বেশীর ভাগ সামন্তরাজরা গুপ্ত সম্রাটের অধীনতা মেনে নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন। গুপ্ত আমলের আগে বাংলার ধর্ম ছিল লোকায়ত। লোকে শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী প্রভৃতি গ্রাম-দেবতার পূজা করত। গুপ্ত আমলে পৌরাণিক ধর্ম এসে লোকায়ত ধর্মের পাশে স্থান করে নিল। ফলে বিষ্ণু, কৃষ্ণ, বাসুদেব, শিব নানা মূর্তিতে দেখা দিলেন।

ভাষা ও সাহিত্য ঃ বাংলাভাষার উদ্ভবের আগে বাঙ্গালী প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চা করত। মহাস্থান গড়ে পাওয়া প্রাকৃত ভাষায় লেখা শিলালিপি মৌর্য যুগের বাঙ্গালীর একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন। এর প্রায় পাঁচশ' বছর পরে শুশুনিয়ার পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা রাজা চন্দ্রবর্মার যে

লিপি পাওয়া গেছে, সেটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। গুপ্ত যুগে সংস্কৃত ভাষাতেই নানারকম গ্রন্থ রচনা করে বাঙালীর যথেষ্ট সুনাম হয়।

● বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ

প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার নানা জায়গায় ভারতীয়রা বাণিজ্য উপলক্ষে উপনিবেশ তৈরি করে বসবাস শুরু করে। কালে কালে এই উপনিবেশগুলি ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়। মৌর্য যুগে পাটলিপুত্রের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার গ্রীকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সিরিয়ার গ্রীকরাজ সেলুকস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে একজন গ্রীক দূত পাঠান। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পশ্চিম এশিয়া ও মিশর পর্যন্ত প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। কুষাণ যুগের মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ও সংস্কৃতি ঃ মানচিত্রে দেখানো বর্তমান 'তুর্কীস্তান'-ই হচ্ছে মধ্য এশিয়া। এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে ছিল পাহাড় আর মরুভূমি। উত্তরপূর্ব সীমানায় খোটান, কাশগড়, ইয়ারকন্দ, কুচা, তুরফান প্রভৃতি অঞ্চলগুলি জনপদ। কুষাণ যুগে এই অঞ্চলে অনেকগুলি ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারের ফলে এই সব স্থান ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে ওঠে। এই অঞ্চল থেকে দু'টি বাণিজ্য পথ উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্ত হয়ে চীনদেশ পর্যন্ত গেছে। এই পথ ধরেই পরবর্তীকালে চীনাপর্যটক ভারতে এসেছিলেন। মধ্য এশিয়া থেকেই বৌদ্ধধর্ম চীনে এবং পরে চীন থেকে কোরিয়া হয়ে জাপানে যায়।

কালে কালে এই জনপদগুলি ধ্বংস হয়ে যায় এবং মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন মরুভূমির বালির নিচে চাপা পড়ে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে খোটান অঞ্চলে কয়েকটি ধ্বংসস্তূপের নীচে থেকে বহু বৌদ্ধ মঠ, স্তূপ, ভারতীয় বর্ণমালায় লেখা পুঁথি, দেবদেবীর মূর্তি ও বুদ্ধ-মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঃ তাম্রলিপ্ত ও কলিঙ্গ বন্দর থেকে ভারতীয়রা জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, ইন্দোচীনের কিছু অংশ এবং সুমাত্রা, জাভা, বালি প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে বাণিজ্য করতে যেত। এর পরে ঐ সব জায়গায় ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে এবং কালে কালে ভারতীয় নামধারী বিভিন্ন রাজবংশ শাসন ক্ষমতায় আসে। কাম্বোডিয়া (কম্বোজ), চম্পা

আনাম) এবং সুমাত্রা, জাভা, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপসমূহে ভারতীয় উপনিবেশ-রাজ্যের পত্তন হয়েছিল। সেই সূত্রে এই সমস্ত জায়গায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে।

এ ছাড়া সম্রাট অশোকের আমলে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম (থাইল্যান্ড) ও সিংহলে (শ্রীলঙ্কা) বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সূত্রে এই সব দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

● **বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ**

মৌর্য যুগে মেগাস্থিনিস নামে একজন গ্রীক পর্যটক এবং গুপ্ত যুগে ফা-হিয়েন নামে এক চীনা পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসেন। তাঁদের লেখা বিবরণী থেকে সে সময়কার ভারতীয় সমাজের অনেক কিছু জানতে পারা যায়।

মেগাস্থিনিসের বিবরণী ঃ মেগাস্থিনিস ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ-দরবারে গ্রীকরাজ সেলুকসের দূত। তিনি বহুদিন পাটলিপুত্রে বাস করে তাঁর অভিজ্ঞতা একখানি গ্রন্থে লিখে রাখেন। মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরীর খুব সুখ্যাতি করেছেন এবং মৌর্য সম্রাটের প্রাসাদকে পারস্য সম্রাটের প্রাসাদের চেয়েও সুন্দর বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে নগর পরিচালনার জন্য একালের মতো পৌরসভা ছিল। তাতে ছয়টি বিভাগ ছিল। গ্রামগুলি মোটামুটি স্বাধীন ছিল এবং গ্রামবৃদ্ধেরা গ্রামের শাসন পরিচালনা করতেন। উৎপন্ন শস্যের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজস্ব হিসাবে রাজকোষে জমা দিতে হতো। এ ছাড়া নানা রকমের কর আদায় করা হতো।

সমাজে সাত রকম শ্রেণীর মানুষ ছিল—দার্শনিক, অমাত্য, গুপ্তচর, কৃষক, সৈনিক, বণিক, কারিগর ও পশুপালক। সমাজে প্রধান শ্রেণী ছিল চারটি। গ্রীস বা রোমের মতো না হলেও ভারতবর্ষে এক ধরনের ক্রীতদাস ছিল। মেগাস্থিনিস-এর বিবরণে জানা যায়, দেশে চুরি-ডাকাতি হতো না। চুরি-ডাকাতির জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। মহিলারাও অনেকে সুশিক্ষিতা ছিলেন। এক শ্রেণীর মহিলা সম্রাটের প্রহরিণীর কাজ করত। সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রথা চালু ছিল।

ফা-হিয়েনের বিবরণী ঃ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন বৌদ্ধ তীর্থ এবং বৌদ্ধ ধর্মের পুঁথিপত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন। তিনি এসেছিলেন গোবি মরুভূমি পার হয়ে হাঁটা পথে। ফা-হিয়েন দশ বছর ভারতের নানা জায়গা ঘুরে দেখেন। ফা-হিয়েনের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, এ দেশ তখন ধনধান্যে পূর্ণ ছিল। সাধারণ লোক সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাত। দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। প্রজারা উৎপন্ন শস্যের

ছয় ভাগের এক ভাগ রাজকর দিত। কোন অপরাধের জন্য কাউকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হতো না। সামান্য অপরাধের জন্য জরিমানা নিয়ে অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া হতো। সকলেরই স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার অধিকার ছিল। ভারতের বাইরে নানা দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। তাম্রলিপ্ত ছিল সমুদ্রতীরের বড়ো বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

ফা-হিয়েন অশোকের রাজপ্রাসাদ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এমন সুন্দর ইমারত কোন মানুষের তৈরী নয়, কোন দেবতা বা দানবের তৈরি। তিনি নানা ভাবে গুপ্ত সম্রাটদের শাসনপ্রণালীর প্রশংসা করে গেছেন।



ফা-হিয়েন

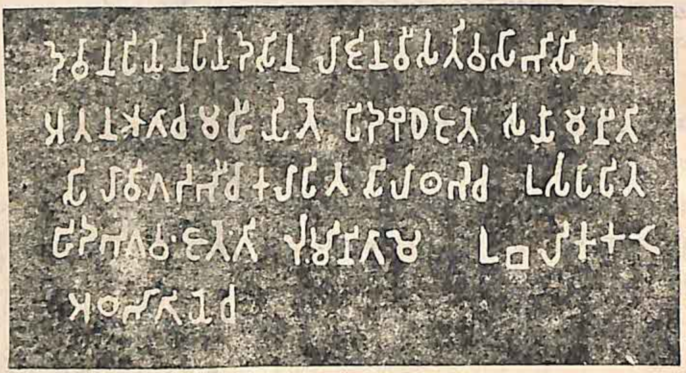
● **প্রাচীন ভারতে প্রতিভার বিকাশ**

শিল্পে ও স্থাপত্যে : প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পকলার যে সমস্ত পুরানিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন কাল থেকে ভারতে শিল্পচর্চার প্রচলন ছিল। নব্য প্রস্তর যুগে তৈরি সরঞ্জামাদির মধ্যেও শিল্পরুচির পরিচয় মেলে। মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া খোদাই-করা সীল, কুঁজওয়ালা ষাঁড়, বাইসন প্রভৃতি জীবজন্তু নিয়ে আঁকা ছবিগুলি সেরা শিল্পকীর্তি।

মৌর্যবংশের শাসনকালেই ভারতীয় শিল্পকলার যথার্থ বিকাশ ঘটে; সম্রাট অশোকের আমলে কতকগুলি একশিলা স্তম্ভ (মনোলিথিক পিলার) তৈরি হয়। তার গায়ে অশোকের অনুশাসনগুলি খোদাই করে রাখা হতো। অশোকের অনুশাসনেই প্রথম প্রাচীন ভারতীয় লিপি **ব্রাহ্মীলিপির** ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বারাণসীর কাছে সারনাথের অশোক-স্তম্ভটিও উল্লেখযোগ্য। এই স্তম্ভের উপর পিঠে পিঠ লাগিয়ে থাকা চারটি সিংহমূর্তি এবং অন্যান্য জীবজন্তুর ছোট ছোট মূর্তি উঁচুদরের শিল্পকলার দৃষ্টান্ত। সারনাথের স্তূপ, সাঁচি স্তূপ প্রভৃতি সেকালের স্থাপত্য শিল্পের গৌরবের সাক্ষী হয়ে এখনও টিকে আছে।

গ্রীক ও রোমক শিল্পরীতির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরীতি মিশে কুষাণ যুগে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এক নূতন শিল্পরীতির সৃষ্টি হয়। তার নাম 'গান্ধার শিল্প'।

মথুরায় সম্রাট কণিষ্কের পাথরে তৈরি যে কবন্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে তাতে গান্ধার শিল্পের ছাপ স্পষ্ট। এই যুগে অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির ও মঠ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তার বেশীর ভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে অশোকের আমলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য গুহা তৈরি হয়। পরে তার



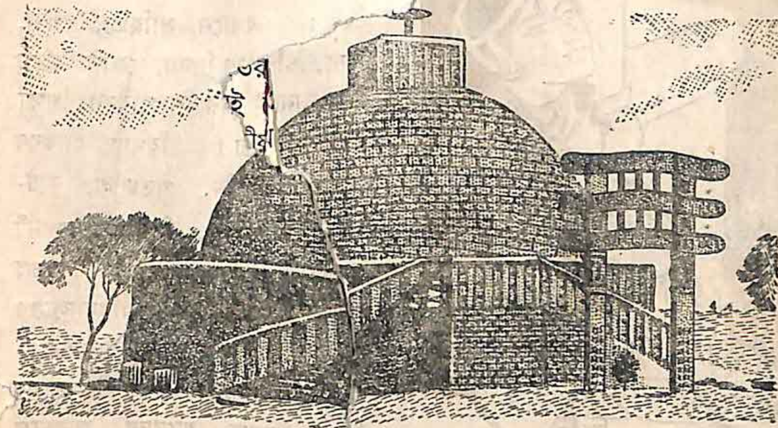
প্রথম প্রাচীন ভারতীয় লিপি : ব্রাহ্মীলিপি

অনেকগুলিকে চৈত্য বা দেবায়তন হিসাবে ব্যবহার করা হতে থাকে। চৈত্যগুলির শিল্পকাজও ছিল চমৎকার।

গুপ্ত যুগে ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের চরম উন্নতি ঘটে। এই যুগে পাথর ও ব্রোঞ্জে তৈরি বুদ্ধমূর্তিগুলি শিল্পসৌন্দর্যে অতুলনীয়। শিব, বিষ্ণু এবং অন্যান্য হিন্দু দেবতার মূর্তিগুলিও ভারতীয় শিল্পের অমর অবদান। গুপ্ত যুগের তৈরি স্বর্ণমুদ্রার মধ্যেও সুন্দর শিল্পরুচির পরিচয় মেলে। এই যুগে লোহা ঢালাই এবং চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। দিল্লীর কুতুবমিনারের কাছে যে লৌহস্তম্ভ রয়েছে, সেটি গুপ্ত যুগের ধাতু ঢালাই শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। আর অজন্তা গুহার দেওয়াল-চিত্রগুলি গুপ্ত যুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পের মহিমায় উজ্জ্বল।

চিত্রশিল্পেও সেকালের ভারতীয়দের কৃতিত্ব ছিল উঁচু দরের। অজন্তার দেওয়াল-চিত্রগুলিতে (ফ্রেস্কো পেণ্টিং) তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হায়দরাবাদের অজন্তা পাহাড়ের গুহা কেটে অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠ তৈরি হয়েছিল। মঠগুলির দেওয়ালে ও ছাদে আঁকা রয়েছে বুদ্ধের জীবনকাহিনী এবং পৌরাণিক গল্প নিয়ে অনেক রকমের চিত্র। অজন্তার 'বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি', 'মা ও ছেলে' প্রভৃতি চিত্রগুলির জগৎজোড়া খ্যাতি।

সাহিত্যে ঃ বেদকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়, তাকে বলা হয় **বৈদিক সাহিত্য**। বৈদিক যুগের পরে কুষাণ যুগে এসে ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম বিকাশ ঘটে। কবি-নাট্যকার অশ্ব ঘোষের **বুদ্ধচরিত** এবং **সৌন্দরানন্দ**



সারনাথের সাঁচি স্তূপ

কাব্য, বসুমিত্রের বৌদ্ধ দর্শনের **মহাবিভাষা**, নাগার্জুনের **মাধ্যমিক সূত্র**, গুণাঢ্যের **বৃহৎকথা**, আয়ুর্বেদাচার্য চরকের **সংহিতা** এই যুগের অমর সৃষ্টি।

গুপ্ত যুগে এসে এই সাহিত্য সৃষ্টির জোয়ার বয়ে যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মগ্রন্থ এবং অজস্র কাব্য, নাটক, কথা-সাহিত্য রচিত হয়। সমুদ্রগুপ্ত নিজে ছিলেন সাহিত্যের অনুরাগী। তাঁর সভাকবি ছিলেন **হরিষেণ**। তিনিই এলাহাবাদের স্তম্ভের গায়ে সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। মহাকবি কালিদাস ছিলেন গুপ্ত যুগের মানুষ। তাঁর লেখা **অভিজ্ঞান শকুন্তলম্** নাটক, **রঘুবংশম্**, **কুমারসম্ভবম্** ও **মেঘদূতম্** কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ছাড়া বিশাখদত্তের **মুদ্রারাক্ষস** এবং শূদ্রকের **মৃচ্ছকটিক** নাটক এই যুগের সেরা সৃষ্টি। গুপ্ত যুগে এসেই রামায়ণ ও মহাভারত সম্পূর্ণ আকার ধারণ করে।

শিক্ষায় ঃ প্রাচীন ভারতে লেখাপড়ার প্রথম পাঠ হতো গুরুগৃহে ও পাঠশালায়। তবে উচ্চশিক্ষা লাভেরও ব্যবস্থা ছিল। তখন প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ ছিল বারাণসী, তক্ষশীলা, বিদর্ভ, অজন্তা ও নালন্দা। এর মধ্যে **তক্ষশীলা ও নালন্দার** খ্যাতি ছিল সুদূর প্রসারী। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সারা এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিন্ধু নদের অপর পারে ছিল তক্ষশীলা। ভারতের বিভিন্ন

অঞ্চল এবং ভারতের বাইরে গ্রীস, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে ছাত্ররা এখানে উচ্চশিক্ষার জন্য আসত। বিনাখরচে ছাত্রাবাসে থেকে তারা লেখাপড়া করত। দেশের ধনী লোকেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ জোগাতেন। এখানে সাহিত্য, দর্শন, অংক, চিকিৎসা বিদ্যা, জোতির্বিদ্যা এবং নানা প্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। বিখ্যাত ব্যাকরণ লেখক পাণিনি, পতঞ্জলি, কূটনীতিজ্ঞ চাণক্য, চিকিৎসাবিজ্ঞানী চরক প্রমুখ বিখ্যাত মনীষী বিভিন্ন সময়ে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন।



অজন্তা চিত্র ঃ মা ও ছেলে

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে শ্বেত হূণদের আক্রমণে তক্ষশীলা ধ্বংস হয়ে যায়। এর পর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নালন্দা ছিল পাটলিপুত্র বা পাটনার অদূরে। গুপ্ত রাজারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালাবার জন্য কয়েকখানি গ্রামের উপস্বত্ব দান করেন। পরবর্তীকালে আচার্য ধর্মপাল ও শীলভদ্রের সময়ে নালন্দার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

● বিজ্ঞান

জ্যোতির্বিজ্ঞান ঃ প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন গড়ে উঠেছিল ধর্মের উপর ভিত্তি করে। ধর্মের প্রয়োজনেই তাঁরা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করতে করতে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের জন্ম হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে **বরাহমিহির** এবং **আর্যভট্টের** নাম স্মরণীয়। পৃথিবী ঘোরে বলেই যে দিনরাত্রি ঘুরে ঘুরে আসে, চন্দ্র বা অন্য গ্রহের যে আলো নেই, সূর্যের আলোতেই তারা আলোকিত, আর্যভট্ট প্রথম এই সব মত প্রকাশ করেন। আর্যভট্ট চন্দ্র ও সূর্য-গ্রহণের কারণও জানতেন। তাঁর স্মৃতি অক্ষয় করে রাখবার জন্য ভারতে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম রাখা হয়েছে আর্যভট্ট।

গণিত বিজ্ঞান ঃ অংকশাস্ত্রে বা গণিত বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অবদান অতুলনীয়। ভারতীয়দের সবচেয়ে বড়ো দান হলো পাটীগণিতে এক থেকে নয়

পর্যন্ত সংখ্যা এবং শূন্য আবিষ্কার। আরবেরা ভারতীয়দের কাছ থেকেই সংখ্যা গণনার রীতি শেখে, আবার আরবদের কাছ থেকে শেখে ইউরোপের লোকেরা। প্রাচীন ভারতীয় গণিত বিজ্ঞানের সঙ্গে আর্যভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্তের নাম জড়িত হয়ে আছে। ভারতে জ্যামিতিচর্চার আরম্ভ হয় বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের বেদী নির্মাণ থেকে। তার চরম বিকাশ ঘটে গুপ্ত যুগে।

রসায়ন বিজ্ঞান ঃ রসায়ন বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতীয়েরা যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন। এই উন্নতির মূলে ছিল দুটি কারণ—শ্রমশিল্প এবং চিকিৎসাবিদ্যা। প্রাচীন ভারতে ঢালাই লোহার রাসায়নিক উৎকর্ষ চরমে উঠেছিল। খ্রীষ্টের জন্মের আগেকার দ্বিতীয় শতকে রাসায়নিক নাগার্জুন পাতন ও জারণ প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। তাছাড়া পারদ ও গন্ধককে খাবার ওষুধের সঙ্গে ব্যবহারের রীতি আবিষ্কার তাঁর বিশেষ কীর্তি।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ঃ অথর্ববেদের সময় থেকেই ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা আয়ুর্বেদের সূচনা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসাবে শব-ব্যবচ্ছেদ বা মড়া কাটার বিদ্যা এবং শারীরবিদ্যার উদ্ভব হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে **আত্রেয়, সুশ্রুত** এবং **চরক** তিনটি বিখ্যাত নাম। অস্ত্রচিকিৎসার জনক হিসাবেই সুশ্রুতের নাম সবচেয়ে বেশী।

অনুশীলনী

● সাধারণ প্রশ্ন

১. আর্যদের ভারতে বসতি স্থাপনের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
২. বেদ কয়টি এবং কি কি ? সবচেয়ে পুরানো বেদের নাম উল্লেখ করো।
৩. প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পরিচয় জানবার পক্ষে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলো।
৪. জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের কারণ উল্লেখ কর। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের সার কথা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।
৫. মৌর্য সম্রাটদের শাসনকাল সম্পর্কে যা' জানো সংক্ষেপে বিবৃত করো।
৬. কণিষ্কের মৃত্যুর পর থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করো।
৭. প্রাচীন বাংলার সমাজ-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যা' জানো বলো।
৮. প্রাচীন বঙ্গদেশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করো।
৯. প্রাচীন বঙ্গদেশের শিল্পকলা ও ধর্মচর্চার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
১০. ভারতবর্ষের বাইরে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করো।
১১. মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন ও সংস্কৃতি বিস্তার নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।

১২. মেগাস্থিনিসের বিবরণী থেকে সেকালের ভারতীয় জীবন পরিচয় পাওয়া যায়, তা' সংক্ষেপে বিবৃত করো।
১৩. ফা-হিয়েনের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে সেকালের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কী জানো সংক্ষেপে আলোচনা করো।
১৪. প্রাচীন ভারতে শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে উন্নতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১৫. সাহিত্যে ও শিক্ষায় প্রাচীন ভারতীয়দের কৃতিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
১৬. প্রাচীন কালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভারতীয়দের উন্নতি সম্পর্কে যা' জান সংক্ষেপে আলোচনা করো।

● মৌখিক প্রশ্ন

১. আর্যরা উত্তর ভারতের নাম কী রেখেছিলেন?
২. গঙ্গা ও যমুনার অববাহিকা অঞ্চলের দেশগুলিকে কী বলা হতো?
৩. বৈদিক সমাজে চার বর্ণের উল্লেখ করো।
৪. 'বেদ' কথাটির অর্থ কী? বেদ কয়খানি? প্রাচীনতম বেদের নাম কী?
৫. বৈদিক যুগে গ্রামের কর্তাকে কী বলা হতো?
৬. কোন্ গ্রন্থকে 'আদি কাব্য' বলা হয়ে থাকে?
৭. প্রাচীন ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির কথা কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যায়?
৮. জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতার নাম বলো। তীর্থংকর কথাটির অর্থ বলো?
৯. গৌতম বুদ্ধের আর একটি নাম কী ছিল? 'বোধি' কথাটির অর্থ কী?
১০. গুপ্তসম্রাটদের মধ্যে শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা কে ছিলেন?
১১. প্রাচীন বঙ্গদেশের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের একটি জনপদের নাম বলো।
১২. প্রাচীন বঙ্গদেশের কোন্ অংশকে গৌড় বলা হতো?
১৩. সমগ্র বঙ্গদেশ কোন্ সময়ে প্রথম 'বাংলা' নামে পরিচিত হয়?
১৪. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে গ্রীক দূত পাঠিয়েছিলেন কে?
১৫. কোন্ সময়ে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে?
১৬. কোথায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে?
১৭. কোন্ সময়ে ভারতীয় শিল্পকলার যথার্থ বিকাশ ঘটে?
১৮. মহাকবি কালিদাসের লেখা একখানি কাব্যগ্রন্থের নাম করো।
১৯. প্রাচীন ভারতের একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম বলো।
২০. প্রাচীন ভারতীয় রাসায়নিকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন কে?
২১. একজন প্রাচীন ভারতীয় গণিত বিজ্ঞানীর নাম বলো।
২২. প্রাচীন ভারতীয় অস্ত্র চিকিৎসার জনক কে ছিলেন?
